কলিকাতার

পারিবারিক ইতিহাস

প্রথম খণ্ড

রাজা দিগম্বর মিত্র ও তাঁহার

বংশকথা

সাহিত্যাচার্য্য

পণ্ডিত শ্রীশিবেন্দ্রনারায়ণ শাস্ত্রী

প্রণীত ও সম্পাদিত

প্রকাশক

রামকৃষ্ণ-সাহিত্য-কুটীর

৭১ নং পটুয়াটোলা লেন

কলিকাতা

মূল্য এক টাকা মাত্র

প্রকাশক

শ্রীঅমিয়রঞ্জন সিংহ

রামকৃষ্ণ-সাহিত্য-কুটীর

৭১ পটুয়াটোলা লেন

প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার

সাহিত্যাচার্য্য শাস্ত্রীর

সর্ব্বজন-প্রশংসিত অন্যান্য পুস্তকাবলী

১।	স্মৃতিপূজা	... ...	॥০ আনা
২।	পতিত-জাতির কর্ম্মবীর	...	২ টাকা
৩।	যোগবল-রহস্য	... ...	২॥০ ,,
৪।	নবযুগের কর্ম্মবীর	... ...	২ ,,
৫।	মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ	... ...	১।০ ,,
৬।	হিন্দুনারী	... ...	১।০ ,,
৭।	মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ ২য় খণ্ড	...	১।০ ,,
৮।	**The Fair Sex of India**	...	১।০ ,,
৯।	পদ্যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	... ...	১৲ ,,

[পুস্তকগুলির বিস্তৃত বিবরণ গ্রন্থের শেষভাগে দ্রষ্টব্য]

মুদ্রাকর

শ্রীবলাইচরণ ঘোষ

ডায়মণ্ড প্রিণ্টিং হাউস

৭৯-এ দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

উৎসর্গ-পত্র

স্বর্গীয় পরম

বদান্যবর ও স্বজাতিবৎসল

পুণ্যশ্লোক রাজা দিগম্বর মিত্র সি-এস-আই

বাহাদুরের সুযোগ্য বংশধর ও পৌত্র

"ঝামাপুকুর রাজবাটী"র

কুমার শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুরের

শ্রীকর-কমলেষু:—

মহাত্মন্!

তখন উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ। এই যুগ-সন্ধিক্ষণে বাঙ্গালার জাতীয় জীবন-সত্তার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্র, শিক্ষা ও সাহিত্যক্ষেত্রে—এই সন্ধিক্ষণে বসন্তের সমাগমে নির্জ্জীব তরু-লতার নব-পত্র-পল্লবে সঞ্জীবিত হওয়ার মতই সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা—বনরাজি-নীলা বঙ্গভূমি এক নবমূর্ত্তিতে গড়িয়া উঠেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহন, রামগোপাল ঘোষ, মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি যে সকল মণীষি রাষ্ট্রে, সমাজে, সাহিত্যে ও কাব্যে—সকল দিক দিয়া জননী জন্মভূমিকে নবরূপ দানে দুর্ব্বল বাঙ্গালী জাতিকে নবযুগের উষারুণালোকে উদ্দীপ্ত করিতেছিলেন, পুণ্যশ্লোক রাজা দিগম্বর মিত্র তাঁহাদেরই অন্যতম। রাষ্ট্রক্ষেত্রে সুবিখ্যাত "ব্ল্যাক এ্যাক্টে" (Black Act)র সমর্থনে—দেশের দরিদ্র লোকের উপর গবর্ণমেণ্টের অতিরিক্ত কর-নির্দ্ধারণের প্রতিকূলে—সতীদাহ প্রভৃতি

অনাচারের দমনে—দুর্ভিক্ষ ও মহামারী-রোগের প্রকোপ-প্রশমনে—শিক্ষার উন্নতি ও সাহিত্যের প্রগতিকল্পে তিনি যে কঠোর পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা নাই। অমর কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত নিজের দারিদ্র্যের জন্য একসময়ে খেদোক্তি করিয়া গাহিয়াছিলেন,—

হায় মা ভারতি, চিরদিন তোর,
কেন এ কুখ্যাতি ভবে।
যে জন সেবিবে, ও পদ-কমল,
সেই সে দরিদ্র হবে॥

সাহিত্যের প্রগতির জন্য স্বর্গীয় রাজার ঈদৃশ অনুরাগ ছিল যে, বদান্যবর রাজা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ বিপুল দানের দ্বারা অমর-কবির দরিদ্রতা বহুলাংশে নিরাকৃত করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজা বাহাদুরের এতগুলি সদ্‌গুণ-বিজড়িত কীর্ত্তিরাশি একালের বাঙ্গালীজাতি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তাই আমরা স্বজাতি সাধারণের অবগতির জন্য তাঁহার পবিত্র জীবন-কাহিনী ও বংশকথা গ্রন্থাকারে চয়ন করিলাম।

ভবদীয় জ্যেষ্ঠাগ্রজ কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর ও আপনি—রাজা বাহাদুরের সুযোগ্য বংশধর। রাষ্ট্রে, সমাজে, শিক্ষায়, ধর্ম্মে ও সাহিত্যে আপনারা উভয় ভ্রাতাই রাজাবাহাদুরের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছেন। আবার কুমার মন্মথনাথের আপনি "বড় আদরের ছোট ভাইটি"; তাই আমরা রাজাবাহাদুরের পবিত্র কীর্ত্তিরাশিপূর্ণ বংশকথা—আমাদের এই ক্ষুদ্র 'চয়নিকা', ভক্ত-সাধকের "গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার ন্যায়" আপনারই পবিত্র করকমলে ভক্তি-অর্ঘ্যরূপে সমর্পণ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইলাম। নিবেদন ইতি।—

শুভ রথ-দ্বিতীয়া
সন ১৩৪০ সাল

—ভবদানুগ্রহাকাঙ্ক্ষিণঃ—
দীন-গ্রন্থকার

রাজা দিগম্বর মিত্র সি-এস-আই

কলিকাতার
পারিবারিক ইতিহাস

কোন্নগরের মিত্রবংশ
রাজা দিগম্বর মিত্র, সি, এস, আই

ভারতে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ও কায়স্থ-জাতি

—*(*)*—

ভগবান গীতায় বলিয়াছেন,—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ"

—অর্থাৎ হে কৌন্তেয়, গুণকর্ম্মানুসারে আমি চতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি।' এই গুণকর্ম্মানুসারে স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি প্রকার জাতি ও তাহাদের চারিপ্রকার কর্ম্মপদ্ধতি ভগবৎকর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে অর্থাৎ ব্রাহ্মণের যজন, যাজন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপন, ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজ্যশাসন, বৈশ্যের ব্যবসা-বাণিজ্য ও

শূদ্রের সেবাধর্ম্ম বিধিনির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভারতবর্ষে যতদিন আর্য্যজাতির গৌরব মধ্যাহ্ন-রবির ন্যায় সমুজ্জ্বল দীপ্তিতে দীপ্যমান ছিল, ততদিন চতুর্ব্ববর্ণের এই চতুর্ব্বিধ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের চরমোৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল; এই চরমোৎকর্ষতার ইতিহাস আলোচনায় আজ বিংশ শতাব্দীর সমগ্র সভ্যজগত বিস্ময়-বিমূঢ়। কিন্তু আর্য্যজাতির অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিলোপ সংঘটিত হওয়ায় ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া সদাগরী অফিসের কেরাণী বা পাকঘরের "ঠাকুরে"র হীনবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে এবং অসিজীবি ক্ষত্রিয়েরাও মসীজীবি কায়স্থ জাতিতে পরিণত হইয়াছে।

কিন্তু সময়ে সময়ে কায়স্থজাতির মধ্যে রণ-প্রীতি ও শাসন-প্রতিভাদ্যোতক প্রমাণাদি দৃষ্টে এই মসীজীবি জাতির মধ্যে যে ক্ষত্রিয়-রক্ত প্রবাহিত আছে, তাহা নিঃশংসয়ে প্রমাণিত হয়। মোগল বাদশাহের আমলেও সুবে বাঙ্গালার বারটি সরকারের মধ্যে নয়টি সরকার কায়স্থ-ভূম্যাধিকারী বা ভূঞা-গণের শাসনাধীনে ছিল। বার ভূঞাগণের অধিকাংশই কায়স্থ ছিলেন, তখন বঙ্গভূমির তৃ-চতুর্থাংশ কায়স্থ রাজগণের অধিকার ভুক্ত ছিল—তাঁহাদের অধীনে সহস্র সহস্র পদাতিক, অশ্বারোহী নিষাদী সৈন্য, রণতরী ও নৌ-সৈন্য থাকিত। কায়স্থ ভূঞা-গণের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ, অখণ্ড শক্তিশালী বিশাল মোগল-সাম্রাজ্যকেও থরথরি কম্পান্বিত এবং কুটবুদ্ধি আকবর

বাহশাহকেও বিচলিত ও সন্ত্রাসিত করিয়া তুলিয়াছিল। যথা কবি ভারতচন্দ্র গাহিয়াছেন,—

যশোর নগর ধাম, প্রতাপ আদিত্য নাম
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ।
নাহি মানে পাতশায়, কেহ নাহি আঁটে তায়
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ ॥

ইতিহাসের পৃষ্ঠায় কায়স্থ রাজগণের এই রোমাঞ্চকর-কাহিনী আজ স্বপ্নরাজ্যের ঐন্দ্রজালিক কাহিনী বলিয়া বোধ হইলেও ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভে রাজা দিগম্বর মিত্রের জীবনে এই ক্ষত্রিয়ত্বের আদর্শ দৃষ্ট হয়। পৌরাণিক যুগে সিংহাসনচ্যুত ক্ষত্রিয় রাজগণ যেমন নানা কৌশলে কঠোর সংগ্রাম চালাইয়া হৃতরাজ্যের পুনরুদ্ধার করিয়া লইতেন, তদ্রূপ রাজা দিগম্বর মিত্র সম্পন্ন গৃহস্থঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াও দৈববশে নিঃস্ব হইয়া প্রনষ্ট সৌভাগ্যের পুনরুদ্ধারকল্পে যেরূপে সামান্তভাবে কর্ম্ম-ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন এবং কঠোর কর্ম্ম-সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া বিস্তীর্ণ জমিদারীর মালিক হন, তাহাতে তাঁহাকে একজন রণকুশলী ক্ষত্রিয়-যোদ্ধা বলিয়াই মনে হয়। হিন্দুজাতির এই অধঃপতনের যুগে জন্মগ্রহণ না করিয়া তিনি দ্বাপর যুগে জন্মগ্রহণ করিলে একাই যেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ জয় করিতে পারিতেন।

পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তি ও দিগম্বরের জন্মকথা

স্মরণাতীত কাল হইতেই কোন্নগরের মিত্রবংশ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে রাজা দিগম্বর কোন্নগরের এই মিত্রবংশে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মকোষ্ঠি নষ্ট হইয়া যাওয়াতে তাঁহার জন্ম তারিখ সঠিক নির্ণয় করিবার উপায় নাই। কলিকাতা ও শ্রীরামপুরের মধ্যবর্ত্তী পুতসলিলা হুগলী নদীর তীরে শ্যামাঞ্চলা কোন্নগর গ্রামখানি অবস্থিত। অর্দ্ধ শতাব্দীরও বহু পূর্ব্বে কোন্নগর গ্রাম মিত্র-কায়স্থগণের উপনিবেশ স্থানের মতই ছিল। বঙ্গদেশের রাজা বল্লাল্ল সেনের দ্বারা কায়স্থ জাতির যে পরিবারত্রয় কুলীন-আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল, তন্মধ্যে মিত্র-কায়স্থ পরিবারে বহু খ্যাতনামা ব্যক্তির জন্মলাভ হইয়াছে। কলিকাতার পারিবারিক ইতিহাসেই আমরা হলওয়েলের 'কাল জমিদার' গোবিন্দরাম মিত্র, অভয়চরণ মিত্র, গোকুল মিত্র, হাইকোর্টের জষ্টিস দ্বারকানাথ ও সার রমেশ চন্দ্র মিত্র প্রভৃতি বহু খ্যাতনামা বিদ্বান কায়স্থগণের নাম পাইয়া থাকি। কোন্নগরের খ্যাতনামা মিত্র-পরিবার ধনী ও সম্মানিত ছিল। স্বগ্রাম কোন্নগরে মিত্রগণ বহু দেবমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। হুগলী নদীগর্ভ হইতে ঐ সকল মন্দিরের সারি সারি চূড়া দর্শন করিয়া যাত্রীরা তাঁহাদিগকে 'মন্দির-

বাটীর মিত্রগণ' বলিয়া অভিহিত করিতেন। ঈদৃশ কীর্ত্তিশালী মিত্র পরিবারেই রাজা দিগম্বর জন্মগ্রহণ করেন। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে বঙ্গদেশের রাজা আদিশূর কাণ্যকুব্জ হইতে যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন এবং তাঁহাদের সঙ্গে যে পঞ্চজন কায়স্থ এদেশে আগমন করেন, রাজা দিগম্বর সেই পঞ্চ কায়-স্থেরই একজনের অধঃস্তন পুরুষ ছিলেন। এই পুরাতন বংশধর হইতে তিনি অষ্টবিংশতি পর্য্যায়ভুক্ত ছিলেন এবং এই পরিবারে সর্ব্বপ্রথম যিনি কুলীন আখ্যা প্রাপ্ত হন, তাহা হইতে ত্রয়বিংশতি পুরুষ ছিলেন। তাঁহার পিতা রামচন্দ্র মিত্র সুবিখ্যাত টয়লার কোম্পানীতে কেশিয়ারের কার্য্য করিতেন। রামচন্দ্র পঞ্চাশ সহস্র টাকা মূল্যের সম্পত্তি ও শিবচন্দ্র, শম্ভুচন্দ্র এবং রাজকৃষ্ণ নামক তিন পুত্র রাখিয়া পরলোকে গমন করেন। পিতার জীবিতাবস্থাতেই তাঁহারা সকলেই ঐ কোম্পানীতে সম্মানজনক চাকুরীতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ শিবচন্দ্র আমদানী-গুদামের সরকার ছিলেন; তাঁহারই ঔরসে দিগম্বর জন্মগ্রহণ করেন।

বর্ত্তমানে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-রেলওয়ে কোম্পানীর পত্তন হওয়াতে কোন্নগর হইতে কলিকাতায় আসিতে মাত্র বিশ মিনিট সময় লাগে। কিন্তু তৎকালে হুগলী নদীগর্ভে তীরগামী পান্সিতে আরোহণ করিয়াই যাতায়াত করিতে হইত। ইহাতে বেশী সময় লাগিত এবং প্রায়শঃ অফিসে নির্দ্দিষ্ট সময়ে যোগ দিতে বিস্তর অসুবিধা হইত বলিয়া শিবচন্দ্র শোভাবাজারে রাজা

নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটে একটি বাড়ী ক্রয় করিয়া কলিকাতাতেই বাস করিতে লাগিলেন। দুই পুরুষ পূর্ব্বে প্রথম শ্রেণীর কারবারে গুদাম সরকারের কাজ প্রচুর লাভজনক ছিল। এরূপ জনপ্রবাদ আছে যে, পামার এণ্ড কোম্পানীর মত সমৃদ্ধ সদাগরী কারবারে তাম্র, লৌহ প্রভৃতি ইস্পাতের দ্রব্য সমূহ ওজনে কম হওয়ায় গুদাম সরকার সৌভাগ্যশালী হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে সদাগর অফিসে সদর মেট্‌ ও বেনিয়ানের পদের নীচেই গুদাম সরকারের কাজ বিশেষ লোভনীয়। কিন্তু শিবপদ বিশেষ উপার্জ্জনক্ষমও ছিলেন না এবং পরিমিত ব্যয়ও করিতেন না। দরিদ্র আত্মীয়-স্বজনের ভরণপোষণ, দীনদুঃখী ও অন্ধ অনাথ আতুরকে বিপুল দান, কলিকাতা ও কোন্নগরের বাড়ীতে প্রতি বৎসর দুর্গাপূজা, কালীপূজা, দোলযাত্রা, রথযাত্রা প্রভৃতি 'বার মাসে তের পার্ব্বণে'র অনুষ্ঠানে এত অধিক ব্যয় করিতেন যে, নিজের উপার্জ্জনে সঙ্কুলান না হওয়ায় পৈতৃক সম্পত্তিতে হাত দিতে লাগিলেন। ইহাতে জীবনের অপরাহ্ণ কালে অর্থাভাবে তাঁহার জীবন দুর্ব্বিসহ কষ্টময় হইয়া উঠিল। কনিষ্ঠ ভ্রাতাও তখন সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ দাবী করিয়া কোর্টে নালিশ করিলে শিবচন্দ্র এই সমস্যা হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য অবশেষে সাংসারিক কার্য্যে বীতস্পৃহ হইয়া হিন্দু-জীবনের শেষ-স্তরের পবিত্র আবাসধাম পুণ্যক্ষেত্র বারাণসী তীর্থে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। কাশীধামে তিনি স্থায়ী বসবাসের জন্য একটি বাড়ী ও ইষ্টদেবতার পূজার্চ্চনার জন্য দুইটি মন্দির

নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার পুত্র দিগম্বর কাশীমবাজারের রাজা কৃষ্ণনাথ রায়ের ষ্টেটে ম্যানেজার হইয়া তাঁহার নিকট হইতে এক লক্ষ টাকা দান স্বরূপ পাওয়া পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁহার কাশীর বাড়ী ও মন্দির তাঁহার প্রপৌত্রগণের তত্ত্বাবধানে তাঁহার পুণ্যস্মৃতি বহন করিয়া এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

দিগম্বরের বাল্যকাল ও বিদ্যাশিক্ষা

রাজা দিগম্বরের বাল্যকাল সম্বন্ধে কিছু জানা না। কোন্নগরেই তাঁহার শৈশবকাল অতিবাহিত হয়। তথায় তাঁহাদের বাড়ীর সন্নিকটেই তাঁহার মাতুল বাড়ী ছিল। তাঁহার পিতা স্বগ্রামে সম্ভ্রান্ত বসু পরিবার হইতে দার-পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। দিগম্বর পঞ্চবর্ষ বয়ঃক্রম কালেই গুরুমহাশয়ের নিকট অক্ষর-লিপি শিক্ষা করিতে থাকেন। আজকাল গ্রাম্য পাঠশালাগুলি ইয়োরোপীয় স্কুল সমূহের আদর্শে উন্নত হইয়াছে। কিন্তু পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্ব্বের গ্রাম্য পাঠশালায় বালকেরা কেবল বর্ণলিপি শিক্ষা করিত; কেবল চাণক্যশ্লোক ও গুরুদক্ষিণার কয়েকটি পাঠমাত্রই তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পড়িতে পাইত। শৈশবে দিগম্বর অতি দুষ্ট-প্রকৃতির ছিলেন। একদা গুরুমহাশয় তাঁহাকে চটের ভিতর পুরিয়া কিয়ৎকাল ইহার মুখবন্ধ করিয়া রাখিয়া তাঁহাকে শাস্তি দেন। কিন্তু মুক্ত হইবামাত্রই বালক দিগম্বর ছুটিয়া গিয়া একটি ইষ্টকখণ্ড সংগ্রহ করেন এবং উহা সজোরে গুরুমহাশয়ের ললাটের দিকে নিক্ষেপ করিয়া প্রতি-শোধ গ্রহণ করতঃ পাঠশালা হইতে জন্মের মত বিদায় লন। ঈদৃশ দুষ্ট-প্রকৃতির বালকই কালে একজন ভূবন-বিখ্যাত ব্যক্তি হইয়াছিলেন।

এইরূপে হঠাৎ প্রাথমিক শিক্ষা ত্যাগ করিয়া দিগম্বর কলি-কাতায় চলিয়া আসেন এবং ইংরাজী শিক্ষায় মনোনিবেশ

করেন। তাঁহার জন্মের দুই বৎসর পূর্ব্বে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে রাজা রামমোহন রায় ও মহাত্মা ডেভিড হেয়ারের চেষ্টায় ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন তখন সবেমাত্র বঙ্গদেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। দিগম্বর কলিকাতায় ডেভিড হেয়ার সাহেবের স্কুলে ভর্ত্তি হন। তৎকালিক প্রসিদ্ধ সমাজ-সংস্কারক মনীষি রামতনু লাহিড়ী এই স্কুলে তাঁহার সমপাঠি ছিলেন। স্কুলের পাঠ শেষ করিয়া তাঁহারা উভয়ে হিন্দু কলেজে ডিরোজিও সাহেবের ক্লাশে ভর্ত্তি হন। তৎকালে পাণ্ডিত্য ও শিক্ষকতাগুণে ডিরোজিও সাহেবের সমতুল্য কেহ ছিলেন না। কলেজে দিগম্বরের অসাধারণ প্রতিভা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবৃত্তির সম্যক স্ফুরণ হয়। তিনি কাব্য, সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল ও দর্শন শাস্ত্রে সমান পাণ্ডিত্য ও ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ১৮৩৪ সালে রামতনু লাহিড়ীর এক বৎসর পরে তিনি কলেজ ত্যাগ করেন। দিগম্বরের শিক্ষা জীবনের একটি ঘটনা সম্বন্ধে লাহিড়ী মহাশয় বলেন যে, দিগম্বরের রচিত একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া হেয়ার সাহেব এত প্রীত হন যে, তিনি উহা তদানীন্তন Public Instructionএর জেনারেল কমিটির সেক্রেটারী স্থদারলেণ্ড সাহেবের নজরে আনেন; স্থদারলেণ্ড মন্তব্য করেন যে, দিগম্বরের ইংরাজী লিখনের ধরণ অতি চমৎকার হইয়াছিল এবং সেই হইতে তিনি তাঁহাকে স্নেহ ও অনুগ্রহের চক্ষে দেখিতে থাকেন।

বিবাহ ও কর্ম্ম-জীবন

বঙ্গদেশীয় রাজা বল্লাল সেন বিশাল কায়স্থ-সমাজের মধ্যে মাত্র ঘোষ, বসু ও মিত্র—এই তিন ঘরকেই কুলীন আখ্যায় সম্মানিত করেন। সামাজিক হিসাবে জাতি মর্য্যাদার হানি না হয়, এইরূপে তিন ঘরের মধ্যে পরস্পর বিবাহ-সম্পর্ক সীমাবদ্ধ রাখাই ইহাদের লক্ষ্য। তদনুসারে কলিকাতার কোন সমৃদ্ধ বসু পরিবারে দিগম্বরের বিবাহ-প্রস্তাব স্থির হয় এবং ১৮৩২ সালে, মাত্র পনর বৎসর বয়সে, যখন তিনি কলেজ-জীবন বহন করিতেছিলেন, তখন তাঁহার বিবাহ হয়; কিন্তু বিবাহের তিন-চার বৎসর পরেই প্রথমা স্ত্রী লোকান্তরিতা হইলে তিনি মদন মিত্রের লেনে বলরাম সরকারের সুলক্ষণা কন্যার সঙ্গে দ্বিতীয়বার পরিণয় সুত্রে আবদ্ধ হন।

দ্বিতীয়বার দ্বার-পরিগ্রহের পর দিগম্বরের কর্ম্ম-জীবন সুচিত হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, তাহার পিতা, ভাগ্য-বিপর্যয়ে পরিবারের স্বচ্ছল অবস্থা যেটুকু ছিল, তাহাও ত্যাগ করিয়া সংসার পরিত্যাগ করেন। দিগম্বরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা তখনও স্কুলে ছিল এবং তিনি বিবাহ করিয়া নিজেকে বোঝাগ্রস্ত করিয়াছেন; এমতাবস্থায় অবিলম্বে কর্ম্মজীবন আরম্ভ করিয়া জীবিকার্জ্জনের চেষ্টা করা তাঁহার পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল। ওকালতি, ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারী বা সরকারী চাকুরী—ইত্যাদিতে এখন-

কার শিক্ষিত যুবকদের ন্যায় সেকালের যুবকদের কর্ম্মক্ষেত্র এত প্রসারিত ছিল না। সুতরাং দিগম্বরের কলেজ-জীবনের পর কর্ম্ম-জীবনের যে অধ্যায়ের সূচনা হইল—তাহা সামান্য শিক্ষকতা মাত্র। কলিকাতায় কোন সুবিধা করিতে না পারিয়া তিনি মফঃস্বলে মুর্শিদাবাদে নিজামত স্কুলে শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু শিক্ষকতা তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল না বলিয়া অল্পকালের মধ্যে তিনি উহা পরিত্যাগ করেন। ইহাতে আমরা তাঁহার যে স্থির-সঙ্কল্প, অপরিমিত উৎসাহ ও অধ্যবসায় গুণে তিনি পরবর্ত্তী জীবনে গৌরব, সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার সুস্পষ্ট বিকাশ দেখিতে পাই। বৎসর কাল পরে স্কুল মাষ্টারী পরিত্যাগ করিয়া তিনি রাজসাহীর কালেক্টার-ম্যাজিষ্টেটের অধীনে ১০০৲ টাকা বেতনে হেড্‌ক্লার্ক নিযুক্ত হন। বিন্তু উহাও তাঁহার রুচিমত না হওয়ায়, পরিত্যাগ করিয়া গবর্ণমেণ্টের খাসমহলের তহসীলদারের কার্য্যে নিযুক্ত হন। কিন্তু দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ এই কর্ম্মও অচিরে পরিত্যাগ করিয়া তিনি বহরমপুরের Infantary lineএ কেরাণীর কার্য্যে নিযুক্ত হন।

এইরূপে তিন বৎসর যাবত সংসার-সমুদ্রে কর্ম্মস্রোতের ঘাত প্রতিঘাতে তাঁহার জীবন-তরণী চলিতে লাগিল। ইহা তাঁহার পক্ষে একপ্রকার ভালই হইয়াছিল। জীবন-বিপ্লবের ঘাত-প্রতিঘাতে তিনি বিশেষ অভ্যস্ত ও বিভিন্ন অভিজ্ঞতায় জ্ঞানবান হইয়াছিলেন। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে তিনি জীবন-ঝঞ্ঝার

আঘাত হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় দেখিতে পাইলেন—জীবনের সূচীভেদ্য অন্ধকার-পথে আশার বর্ত্তিকালোক দেখিলেন। এই সময় কাশিমবাজারের রাজা কৃষ্ণনাথ রায় সাবালকত্ব প্রাপ্ত হইতেছিলেন। তিনি ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের দেওয়ান কান্ত বাবুর পরিত্যক্ত বিস্তীর্ণ জমিদারী-সম্পত্তির মালিক ছিলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত ঐ সম্পত্তি তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করা হইবে, কাজেই তাহার তত্ত্বাবধানের জন্য তরুণ রাজা একজন বিচক্ষণ বুদ্ধিমান ও বিশ্বস্ত ম্যানেজার খুঁজিতেছিলেন। ভাগ্যান্বেষী দিগম্বর সেই সময় কোন ধনীর সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ অন্বেষণ করিয়া কাসিমবাজারে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি রাজার সহিত পরিচিত হইয়া, স্বীয় বুদ্ধিমত্তা, কর্ম্মকুশলতা ও বাক্‌চাতুর্য্যে তাঁহার হৃদয়ে অনুকুল ধারণা বদ্ধমুল করিয়া ঐ পদে নিযুক্ত হন। রাজা কৃষ্ণনাথ তাঁহার কর্ম্মদক্ষতায় মুগ্ধ হইয়া এক সময়ে পারিতোষিক স্বরূপ, তাঁহাকে লক্ষ টাকা প্রদান করেন।

ব্যবসায় ক্ষেত্রে দিগম্বর

কাসিমবাজার রাজের ম্যানেজারের পদ দিগম্বরের জীবনে এক নবযুগের সুচনা করে। জীবনের প্রথম ভাগে তাঁহার মতের কোন নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য বা অর্থার্জ্জনের কোন নির্দ্দিষ্ট উপায় ছিল না। সুতরাং নিজেকে বাঁচাইবার জন্য অতল জলে নিমজ্জমান ব্যক্তির মত সম্মুখে যাহা পাইয়াছিলেন, তাহাই আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন। কিন্তু ম্যানেজারের কার্য্যক্ষেত্রে তিনি নূতন শিক্ষা ও ক্রমোন্নতির পথ পাইলেন। এখানেই তিনি এমন সমস্ত নূতন ধারণা ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিলেন, যাহা তাঁহার ভবিষ্যত উন্নতির পথ, অরুণোদয়ের পূর্ব্ব-মূহুর্ত্তে পুর্ব্বাশার গগনপটে রক্তরাগের ন্যায়, হেমাভ বর্ণে সুরঞ্জিত করিয়াছিল। ষ্টেটে নীলের আবাদ ও তুলার চাষ প্রভৃতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তিনি অনেক ব্যবসায়ী, মহাজন ও ব্যাঙ্কারের সহিত পরিচিত হইলেন। কাশিমবাজার ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে বৃহৎ শিল্ক ব্যবসায় তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। ম্যানেজারের কার্য্যে ইস্তফা দিবার পর, কিছুকালের জন্য তিনি কলিকাতার বাড়ীতে অবসর-জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার অতুল কর্ম্মপ্রেরণা তাঁহাকে অলসভাবে গৃহকোণে অধিক দিন আবদ্ধ না রাখিয়া ব্যবসায়ে সমধিক প্ররোচিত করিয়া তুলিল। তাঁহার সম-সাময়িক তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, প্যারিচাঁদ

মিত্র ও রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি অনেকেই তখন সম্মান জনক ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন। ব্যবসায়ে পূর্ব্বেই তিনি বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন এবং রাজা কৃষ্ণনাথ প্রদত্ত প্রচুর টাকাও মূলধন স্বরূপ তাঁহার পকেটে জমা ছিল। সুতরাং জীবনের ভবিষ্যৎ গতি সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া ১৮১১ সালের শেষ ভাগে তিনি ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়া পড়িলেন।

ঐ সালের নভেম্বর মাসে কারী কোম্পানীর নিকট বিক্রীত ২০০০ হাজার মন চাউলের মূল্য বাবদ ৪০০০ হাজার টাকা আদায়ের মামালা হইতে বুঝা যায় যে, দিগম্বর প্রথমে ঐ ব্যবসায়েই লিপ্ত হন। কিন্তু তাঁহার প্রধান অভিযান—নীল ও সিল্ক প্রস্তুতের ব্যবসায়েই আরম্ভ হইয়াছিল। দিগম্বরের অল্প বয়স কালে এই দুই ব্যবসায়ই বঙ্গদেশে প্রধান ছিল। ইউরোপীয় প্রণালীতে নীল চাযের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। প্রধানতঃ ইহা বাঙ্গালাদেশের মুর্শিদাবাদ, কৃষ্ণনগর ও যশোহর প্রভৃতি জলাভূমিতেই উৎপন্ন হয়। দিগম্বর ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের সহিত পরিচিত হইয়া মালদহে এক বৃহৎ ফ্যাক্টরী খুলিয়া সেই সময়ের উপযোগী নীলের আবাদ ও প্রস্তুত কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। তাঁহার সিল্ক-ব্যবসায়ও অধিকতর বিস্তৃতভাবে চলিতে লাগিল। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী বাণিজ্য-সংক্রান্ত বহু টাকা খাটাইয়া এই ব্যবসায়ের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। রাজা দিগম্বরের সিল্ক-সমূহ ইয়োরোপীয় প্রণালীতে প্রস্তুত হইত এবং ঐগুলিতে নিজ নাম স্বাক্ষরিত ট্রেড মার্ক "ডি, এম" লিখিত হইয়া বিক্রয়ার্থ

বাজারে প্রেরিত হইত। এই ট্রেড মার্ক ক্রমে এত বিখ্যাত হইয়া উঠিল যে, অতি শীঘ্রই বিস্তর ক্রেতা পাওয়া যাইতে লাগিল এবং যে-প্রসিদ্ধ সিল্ক-ব্যবসায়ী মেসার্স ওয়াটসন্ এণ্ড কোম্পানীর সহিত প্রধানতঃ তাঁহার প্রতিযোগীতা চলিতেছিল, মূল্যে ও গুণে তাঁহার সিল্কসমূহ ঐ কোম্পানীর সিল্কেরই সমতুল্য হইয়াছিল। সিল্ক ও নীল প্রস্তুতের সময়ে দিগম্বর ফ্যাক্টরীসমূহ নিজেই পরিদর্শন করিয়া মফঃস্বলে বেড়াইতেন এবং নির্দ্দিষ্ট বিক্রয়-কালে কলিকাতায় চলিয়া আসিতেন। তাঁহার নীলগুলি 'টমাস মাটিন কোং' শেষে আর, টমসন কোং এর মার্টে নীলামে বিক্রয় হইত। সিল্কগুলি মেসার্স জারর্দ্দীন স্কিনার এণ্ড কোং এর হাত দিয়া বিক্রয় হইত। এইরূপে ব্যবসায়ে দিগম্বরের বিস্তর অর্থাগম হইতে লাগিল।

তিন বৎসর যাবত দ্রুত-উন্নতিতে তাহার নীল ও সিল্ক ব্যবসায় চলিতে লাগিল। কিন্তু ১৮৩৭ সালে পৃথিবীব্যাপী ব্যবসাক্ষেত্রে এক ভীষণ আর্থিক সমস্যা দেখা দিল। ইংলণ্ডের কতকগুলি ব্যাঙ্ক ফেল পড়িয়া গেল। কলিকাতায় একটি মাত্র ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান ব্যতীত আর প্রায় সমস্তই ফেল হইল। কলি-কাতায় ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের পতনই এই সমস্যায় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী শোচনীয় ব্যাপার হইয়াছিল। ঐ ব্যাঙ্কের সমস্ত অর্থই নীল ব্যবসায়ে কর্জ্জদানস্বরূপে নিয়োজিত হইয়াছিল এবং শেয়ারে ও নগদ জমায় উহাতে দিগম্বরের বিস্তর টাকা জমা ছিল। ব্যাঙ্ক ফেল পড়ায় রাজা দিগম্বর এত অধিক ক্ষতিগ্রস্থ

হইলেন যে, তিনি একেবারে নির্জ্জীব ও মৃতকল্প হইয়া পড়িলেন। দৈন্য ও অবসাদের করাল মূর্ত্তিতে তিনি বিভীষিকাগ্রস্ত হইয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। নীল ও সিল্কের ব্যবসায়ে আর অগ্রসর হইবার কোন উপায় দেখিতে না পাইয়া, তিনি পুনরায় চাকরীর সন্ধানে সেকালের অন্যতম বিখ্যাত ব্যবসায়ী মতিলাল শীলের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি নবাগত যুবককে কোন অফিসে কাজের সংস্থান করিয়া দিতে মনস্থ করিলেন, কিন্তু তাঁহার যোগ্যতার বিষয় জানিতে পারিয়া তাঁহাকে পুনরায় অধ্যবসায়ের সহিত ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতে উপদেশ করিলেন এবং দরকার হইলে অর্থ-সাহায্য করিতেও প্রতিশ্রুত হইলেন। এইরূপে উৎসাহিত হইয়া দিগম্বর নবদ্যোমে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে সংকল্প করিলেন এবং অল্পকালের মধ্যেই দেখিতে পাইলেন যে, প্রচণ্ড ঝটিকাবর্ত্তের পর প্রশান্ত ভাব, ভাঁটার পর জোয়ার, অভাবের পর প্রাচুর্য্য, এবং অবসাদের পর উত্তেজনা প্রকৃতির নিয়ম—জগতের চিরন্তন সত্য। সুতরাং পুরাতনের ধ্বংসাবশেষের উপর তাঁহার নব-প্রচেষ্টায় নূতনের বিরাট মূর্ত্তি গড়িয়া উঠিল—সাধনা সিদ্ধিলাভ করিল। ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের পতনের সঙ্গে নীল-ব্যবসায়ের পুনরুন্নতির আশা সুদূরপরাহত দেখিয়া তিনি পূর্ব্বের ন্যায় সিল্ক-ব্যবসায়ই চালাইতে লাগিলেন। এইবার সৌভাগ্য লক্ষ্মী তাঁহাকে প্রচুর ধনের অধিকারী করিলেন।

দিগম্বরের কলিকাতা-জীবন – বৃটিশ-ইণ্ডিয়ান-এসোসিয়েসনের পত্তন

উত্থান-পতন, উন্নতি-অবনতি, লাভ ও ক্ষতি—এইরূপ নানা বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া ১৮৩৪ সাল হইতে ১৮৫০ সাল পর্য্যন্ত দিগম্বর দীর্ঘ ষোড়শবর্ষকাল অতিক্রম করিয়া অবশেষে জীবন-যুদ্ধে উত্তীর্ণ হইতে চলিলেন। কর্ম্মসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গাবর্ত্তনে তাঁহার জীবন-তরণী যেন শেষে সুখস্বপ্নবিজড়িত এক প্রশান্তির দেশে আসিয়া পৌঁছিল। বর্ত্তমানে তাঁহার বয়স ত্রিশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে। ব্যবসায় উপলক্ষে তাঁহাকে এতাবৎকাল মফঃস্বলে কাটাইতে হইয়াছিল। আজকাল রেলের রাস্তা, নদীপথে ষ্টীমার, শিক্ষালয়, সংবাদপত্র, লাইব্রেরী ও বিদ্বান লোকদের সভা প্রভৃতি সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে মফঃস্বলে জীবন-যাপন একপ্রকার নির্ব্বাসনতুল্য ছিল। কলিকাতার একজন শিক্ষিত যুবকের পক্ষে তখন মফঃস্বলে অবস্থান কিরূপ কষ্টকর ছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। এই সময় হইতে তিনি কলিকাতায় বসবাসের সঙ্কল্প করেন। অবশ্য এই সিদ্ধান্ত কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তাঁহাকে সিল্ক-প্রস্তুতের কারখানা একেবারে বন্ধ করিতে হয় নাই। তাঁহার পৌত্রগণের দপ্তর-খানায় যে সকল পুরাতন খাতাপত্র রহিয়াছে, তদ্দৃষ্টে জানা যায় যে, তিনি চলিয়া আসার পর, তাঁহার বহরমপুর কুটিতে

১৮৫২ সালে ২,৬৪০০০, ১৮৫৩ সালে ১,৭৬০০০, ১৮৫২ সালে ১,৫৩,০০০ টাকার সিল্ক বিক্রয় হইয়াছিল। দিগম্বর তাঁহার সিল্ক-ফ্যাক্টরীগুলি পিতৃব্য রাজকৃষ্ণের পুত্র প্যারীমোহন মিত্রের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া আসেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে বিশ্বস্ত লোকের অভাবে ঐ গুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

১৮৫১ সালের শেষভাগে তিনি কলিকাতায় তাঁহার কর্ম্ম-জীবন স্থানান্তরিত করেন। ১৮৪৪ সালে তাঁহার পিতা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা পরলোক গমন করিলে, তিনি রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটের বসতবাটী রাজা প্রসন্ননারায়ণ দেবের নিকট বিক্রয় করেন। কেবল কলিকাতার প্রান্তভাগে বাগমারী ও উল্টাডিঙ্গিতে যে কতক জমি ছিল, তাহার সঙ্গে আরও কিছু জমি ক্রয় করিয়া একটি বাগান বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে থাকেন। সৌভাগ্যদেবীর অধিকতর কৃপা, জনসাধারণের নিকট খ্যাতি-প্রতিপত্তি ও অধিকতর বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্র লাভের জন্য তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। সুতরাং কর্ম্ম-প্রবণ জীবন অধিক দিন অলস ভাবে কাটাইতে না পারিয়া তিনি প্রথমেই জাহাজ-সংক্রান্ত ও পরে বীমাবিষয়ক নানাবিধ ব্যবসায়ে সংশ্লিষ্ট হইলেন। ক্রমে সৌভাগ্য-লক্ষ্মী তাঁহার প্রতি চরম সুপ্রসন্না হইলেন—সেই সৌভাগ্যের জন্য তাঁহার কর্ম্ম-সাধনা সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করিল। এই সময় তাঁহার পূর্ব্বতন মুরুব্বি মিঃ সুদারলেণ্ড ২৪ পরগণার অন্তর্গত বিস্তর ভূসম্পত্তি রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী না থাকায়

ঐ সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক মিঃ গারষ্টিন্ উহা বিক্রয়ার্থ সাধারণে উপস্থিত করিলে দিগম্বর ১৮৫৩ সালে সৌভাগ্যের অদ্ভুত প্রেরণাবলে উহার ক্রেতা হইলেন। ৫৬,০০০ টাকার মূল্যে ঐ সম্পত্তি ক্রীত হইল। কিন্তু সম্পূর্ণ মূল্য দিতে অপারগ হইয়া তিনি অর্দ্ধেক মূল্য প্রদান করেন এবং গারষ্টিন্ সাহেবের নিকটেই ঐ সম্পত্তি বাকী অর্দ্ধেকের জন্য বন্ধক রাখেন। পরে সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করতঃ উহা উদ্ধারের জন্য বাগমারীর প্রকাণ্ড বাগান বাড়ী রামবাগানের দত্ত-পরিবারের গোবিন্দ চন্দ্রের নিকট ৩০ হাজার টাকার মূল্যে বিক্রয় করেন এবং সারকুলার রোডে লিচি বাগানে একটি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বাস করিতে থাকেন। পরে ১৮৫৩ সালে ঝামাপুকুর লেনে বৃহৎ অট্টালিকা বাড়ী ক্রয় করিয়া উহাতে উঠিয়া আসেন।

জমিদার সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরে, ঠিক সময়েই দিগম্বর জমীদার হইলেন। জমীদারদের দাবী ও স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্য দ্বারকানাথ ঠাকুর জমিদার-সভার (Land holders Society) স্থাপন করেন। তৎপরে 'তরুণ বাঙ্গালী' নামে অভিহিত কতিপয় স্থিরসঙ্কল্পবিশিষ্ট উদীয়মান যুবক ও মিঃ জর্জ্জ টম্পসনের সংযুক্ত-প্রচেষ্টায় ১৮৪৩ সালে ২০শে এপ্রিল "বেঙ্গল-বৃটিশ-ইণ্ডিয়া-সোসাইটি—ঐ নামে বিলাতে গঠিত এক সমিতির অনুকরণে—এক সমিতি গঠিত হয়। দেশীয় ইতিহাসে এই সোসাইটি এক নবযুগ প্রবর্ত্তন করিয়াছে; কারণ এই প্রতিষ্ঠানই ছিল—বাঙ্গালীর রাজনৈতিক জীবনের প্রথম পথ-

প্রদর্শক। পূর্ব্বোক্ত প্রতিষ্ঠানে ধনিগণের এবং শেষোক্তটিতে বুদ্ধিজীবিগণের বেশী প্রাধান্য ছিল। প্রতিষ্ঠান দুইটি ভিন্ন নামে পরিচিত হইলেও উহাদের সভ্যমণ্ডলী প্রায় একই ছিলেন এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁহারা প্রায়শঃ সমান সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতেন। দেশের সৌভাগ্য এই যে, নব চিন্তায়, নব অনুপ্রেরণায় এই প্রতিষ্ঠানদ্বয় দেশে নব জাগরণের যুগ আনিয়াছে এবং যাঁহারা এযাবত দৌর্ব্বল্য প্রকাশ করিতেছিলেন, তাঁহারাও এখন এই মতে উপনীত হইলেন যে, বিচ্ছেদই দুর্ব্বলতা এবং একতাই শক্তি। সুতরাং শক্তি-সামর্থ্যের কেন্দ্রস্থলীরূপে প্রতিষ্ঠানদ্বয় বিভিন্ন নাম পরিত্যাগ করিয়া "বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসান" নামে পরিবর্ত্তিত হইল। দেশের এই প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক শিক্ষাকেন্দ্র—যাহা ভারতের সমুদয় রাজনৈতিক শিক্ষাকেন্দ্রের জন্মদাতা—১৮৫১ সালের ৩১ ডিসেম্বর গড়িয়া উঠিল। যাঁহাদের সমবেত চেষ্টায় এই মিলন-মন্দির গড়িয়া উঠিয়া দেশে নবযুগের সূচনা করিল, তন্মধ্যে সভাপতি রাজা রাধাকান্ত দেব, সম্পাদক দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর ও সহ-সম্পাদক দিগম্বর মিত্রই প্রধান ছিলেন। বাঙ্গালীর মত-দ্বৈধতাই এই জাতির উপর চিরকলঙ্কের একটা ঘন-মসীরেখা টানিয়া দিয়াছে। কবি বড় দুঃখে গাহিয়াছেন,—

"স্বর্গ মর্ত্ত্য স্থান যদি করে বিনিময়,
তথাপি বাঙ্গালী নাহি হবে একমত।"

সুতরাং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের এই মহামিলন সাধারণের নিকট হইতে বিপুল সম্মানের অর্ঘ্য বহন করিয়া

আনিল। দিগম্বর মিত্রের ইংরাজী চরিত-লেখকের মতে,—no more could Government point to a split between orthodoxy and enlightenment ; between conservatism and liberalism the—two distinguished elements of native society. নবগঠিত এসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য রাজভক্তির প্রণোদক ছিল, কারণ প্রজাসাধারণের রাজনীতি চর্চ্চার একমাত্র পন্থা—শাসক ও শাসিতের মধ্যে মতামত আদান-প্রদানের ব্যাখ্যা করাই উহার উদ্দেশ্য ছিল।

বৃটিশ-ইণ্ডিয়ান-এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই উহার সহ-সম্পাদক রূপে সাধারণের জন্য দিগম্বরের কর্ম্ম-জীবন (career of a public man) আরম্ভ হয়। সহ-সম্পাদকের পদ অনেকের নিকট হয়ত সামান্য হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই পদে অতি প্রয়োজনীয় কার্য্যসকল ন্যস্ত ছিল—যাহাতে তাঁহার মত একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ সহযোগীর দরকার হইয়াছিল। দিগম্বরের চেষ্টাতেই দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবিগণ ইহার স্বার্থরক্ষণে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। এসোসিয়েশন গঠনের অল্প পরে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর Charter এর পুনঃ প্রবর্ত্তনের বিরুদ্ধে দেশের সর্ব্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে একটা দারুণ উত্তেজনা লক্ষ্য ও তীব্র আপত্তির সুর সমর্থন করিয়া এসোসিয়েশন ইংলণ্ডে "হাউস অব কমন্সে"র নিকট যে মেমোরিয়েল প্রেরণ করেন, বহু অকাট্য যুক্তি ও বিতর্ক প্রদর্শন করিয়া

দিগম্বর মিত্রই উহা রচনা করেন। হাউসের কর্তৃপক্ষ ইহা সম্পূর্ণ মঞ্জুর না করিলেও, উহাতে যে সকল দাবী উল্লেখ করা হইয়াছিল, তাহার কতক ফলপ্রসূ হইয়াছিল। পূর্ণ দুই বৎসর কাল কার্য্য-সম্পাদনের পর দিগম্বর ১৮৫৪ সালে ঐ পদ ত্যাগ করেন এবং কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য হইয়া বাৎসরিক ১০০ টাকা করিয়া চাঁদা প্রদান করিতে থাকেন।

দিগম্বরের জনসেবা ও বক্তৃতা

১৮৫০ সালে ভীষণ ক্রুমিয়ান যুদ্ধে নিহত যোদ্ধবর্গের বিধবা ও শিশু সন্তানগনের সাহায্যকল্পে মহারাণী-ভিক্টোরিয়া অর্থ সংগ্রহের জন্য কমিশন গঠন করিয়া যে "পেট্রিয়টিক্ ফাণ্ড" গঠন করেন, তাহাতে দিগম্বর ১০০ টাকা সাহায্য করেন। ১৮৫৭ সালে বিখ্যাত "নেটিভ ব্ল্যাক এ্যাক্টের" সমর্থন সভায় বক্তৃতা দানের জন্য তিনি সাধারণে আবির্ভূত হন।

১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিশ উচ্চতম পদেই উরোপীয় কর্ম্মচারিগণকে নিযুক্ত করিবার স্থির সংকল্প করিয়া নিয়ম করেন যে, এতদ্দেশীয় কর্ম্মচারিগণ মাসিক একশত টাকার উর্দ্ধতন পদে নিযুক্ত হইতে পারিবে না। লর্ড উইলিয়ম বেন্টিকের শাসন কালে ১৮৩১ সালে এই প্রথা রহিত হইয়া যায় এবং ১৮৪৯ সালে ব্যবস্থাপক সভায় চারিটি আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করা হয়। আইনের ঐ পাণ্ডুলিপিগুলির উদ্দেশ্য ছিল—ব্রিটিশজাত প্রজাগণকে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর বিচারালয়ের অধিকারাধীন করিয়া. তৎসংশ্লিষ্ট আইনকানুনাদি প্রবর্ত্তন করা। ইহাতে ইঙ্গো-ইউরোপীয় বে-সরকারী কর্ম্মচারিগণের মধ্যে তাঁহাদের অধিকার সঙ্কোচের জন্য প্রবল আন্দোলনের সৃষ্টি হইল। তাঁহারা দৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত স্ব স্ব অধিকার সংরক্ষণার্থ কলিকাতায় এক জনসভা আহ্বান করিয়া গবর্ণমেণ্টের আচার ও

এই দুর্নীতির সুদৃঢ় প্রতিবাদ করিলেন এবং এই রাজবিধিগুলি ব্ল্যাক এ্যাক্ট অর্থাৎ 'কৃষ্ণ আইন' বা 'অন্ধকার আইন' বলিয়া আখ্যাত করতঃ ইউরোপীয় সম্প্রদায় ঐ সভায় প্রস্তাব গ্রহণ করি-লেন যেনিম্ন আদালত দুইটিতে দেশীয় বিচারকের হস্তে বিচারের ভার ন্যস্ত হওয়ায় উচ্চ আদালতে দক্ষ ও স্বাধীন মতাবলম্বী দুইজন বৃটিশ বিচারকই নিযুক্ত হউক। বৃটিশ-ইণ্ডিয়া-এসোসিয়েশনও এই ব্যাপারটিকে সহজে অতিক্রান্ত হইতে দিলেন না। ১৮৭৫ সালে ৬ই এপ্রিল ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের প্রস্তাবের প্রতিবাদার্থ এসোসিয়েশনের সভ্যগণের উদ্যোগে টাউনহলে স্বতন্ত্র এক মহতী সভা আহুত হয়। হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক রায় কৃষ্ণ-দাস পাল বাহাদুর বলেন,—ঐ সভায় দিগম্বর মিত্রের সুযুক্তি-পূর্ণ বক্তৃতা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। এই সভা 'নেটিভ ব্ল্যাক এ্যাক্ট মিটিং' নামে অভিহিত এবং ব্যবস্থাপক সভায় উত্থাপিত বিলের সমর্থনের জন্যই ইহার অধিবেশন হয়। প্রতিবাদ সভায় বক্তৃতা করিতে উঠিয়া দিগম্বর প্রথমেই বলেন,— * * * কলিকাতায় ও অন্যান্য স্থানের বৃটিশ প্রজাগণের সম্প্রতি যে সভা হইয়াছে, তাহাতে এতদ্দেশীয় বিচারপতিগণের বিচারকার্য্য সম্পর্কে ও তাঁহাদের চরিত্রের উপর তীব্রভাবে কটাক্ষপাত করিয়া দোষারোপ করা হইয়াছে। * * * এই তথা-কথিত অনুপযুক্ততার ব্যাপার যাহাই হউক না কেন,—এই ঘটনা উপলক্ষে যত কেন তীব্র ভাষাতেই তাঁহারা বক্তৃতা করুক না কেন, ঘটনার অবাস্তবতায় ও শূন্যগর্ভতায় বক্তৃগণের উক্তিসমূহ

নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইয়া দাঁড়াইবে (আনন্দ ধ্বনি)। * * তৎপর তিনি সুপ্রীম কোর্টের চিফ্ জাষ্টিসের উক্তি ইত্যাদি হইতে বিচারবিভাগে এতদ্দেশীয়গণের যোগ্যতা প্রমাণ করিয়া বলেন যে,—লর্ড উইলিয়মই এতদ্দেশীয়গণের মধ্যে যে রাজ্যশাসনসংক্রান্ত গুণ রহিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ অবহিত হইয়াছিলেন। আমাদের রাজ্যশাসন-সংক্রান্ত ক্ষমতা সম্বন্ধীয় তাঁহার মত তিনি ১৮৩১ সালে ৫নং রেজিঃতে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন (ক্রমাগত আনন্দধ্বনি)। তাঁহার পর হইতেই তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ দেশীয়গণকে রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করিয়া আসিতেছেন এবং দেশীয়গণও বিচার-শক্তি, জ্ঞান ও দূরদর্শিতা প্রভৃতি দ্বারা নানাপ্রকারে নানা নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন (শুনুন শুনুন)। * * কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের প্রকাশিত Evidences relating to the efficiency of the Native Agency in India" "অর্থাৎ রাজকার্য্যে এতদ্দেশীয়গণের নৈপুণ্যের প্রমাণ" নামক পুস্তকের উল্লেখ করিয়া উচ্চ রাজকর্ম্মে দেশীয়গণের নিয়োগ, তাহাদের যোগ্যতা ও প্রতিভায় বৃটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে কিরূপ কল্যাণকর হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করেন। আজকাল দেশীয়গণের রাজনৈতিক অধিকারের সম্পর্কে কোন আন্দোলন উপস্থিত হইলে 'ইউরোপিয়ান এসোসিয়েশন' প্রথমেই যেরূপ উহাতে আপত্তি তুলিয়া থাকে, ১৮৫০ সালে দেশীয় ইউরোপীয়সম্প্রদায় বিচারবিভাগে দেশীয়গণের নিয়োগকালে ঐরূপ আপত্তি তুলিয়াছিল। সেই সময়

রাজনৈতিক দূরদর্শী দিগম্বর মিত্র নির্ভীক তেজঃস্বিতা সহকারে তাঁহাদের সহিত যেরূপ প্রতিকূলতায় অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা একালের রাজনীতিচর্চ্চাকারিগণের মধ্যে অতি বিরল।

অতঃপর তিনি স্বীয় বিস্তীর্ণ জমীদারীর উন্নতিকল্পে কঠোর পরিশ্রম করিতে থাকেন। তিনি প্রায়শঃ জমীদারীর পরিচালনা-কার্য্য পরিদর্শন ও উহা বৃদ্ধির জন্য জমীদারীর সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতেন। এই সময় হইতেই তিনি জনসাধারণের সেবায় তাঁহার মানবত্বের মূল্যবান বৎসরগুলির যথোচিত সদ্ব্যবহার করিতে থাকেন। তাঁহার শরীর ও মনের অমিতশক্তি, নিজের স্বার্থ অপেক্ষা সাধারণের স্বার্থের জন্যও কর্ম্ম ব্যয়িত হয় নাই। কঠোর পরিশ্রমে তিনি এত অভ্যস্ত ছিলেন যে, কর্ম্ম-সাধনায় কদাচিৎ ক্লান্তি বোধ করিতেন। ১৮৬১ সালে তিনি মিউনিসিপাল কমিশনে যোগদানের জন্য আহুত হন। কলিকাতার উন্নতির জন্য ঐ সময় কয়েকটি "মিউনিসিপাল এ্যাক্ট" হয়। যে উদ্দেশে ঐ সকল আইন হয়, কলিকাতা মিউনিসিপালিটির দোষাবহ কার্য্য-নির্ব্বাহ-প্রণালীর জন্য ঐ সকল আইন কার্য্যে পরিণত না হওয়ায় ধৈর্য্যচ্যুত সহরবাসী অভিযোগ উত্থাপন করিলে ঐ কমিশন গঠিত হয়। কমিশন মিউনিসিপালিটির দোষপূর্ণ কার্য্য-নির্ব্বাহ-প্রণালীর পরিবর্ত্তনের জন্য যে রিপোর্ট দেন, তাহাতে বাঙ্গালা কাউন্সিলে মিউনিসিপালিটির সংশোধনের জন্য একটি বিল উত্থাপিত হয়। ১৮৬৩ সালে ঐ বিল, আবশ্যক পরি-

বর্ত্তনের পর, গৃহীত হইলে দিগম্বর Board of Justice of peace এর মেম্বর ও কলিকাতার অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হন। মিউনিসিপাল বোর্ডের মেম্বররূপে তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকর বহুবিধ সদ্‌কার্য্যে প্রাণপাত পরিশ্রম করেন। ১৮৬১ সালে তিনি ইন্‌কাম্‌টেক্স কন্ফারেন্সে যোগদানের জন্য আহূত হন। বিস্তর অর্থ-ব্যয়ে সিপাহী-বিদ্রোহ দমনের পর দেশে ভয়ঙ্কর আর্থিক সঙ্কট উপস্থিত হয় এবং তাহাতে গবর্ণমেণ্ট দেউ-লিয়া হইবার উপক্রম হয়। এই আর্থিক দুর্দ্দশামোচনের জন্য ইংলণ্ড হইতে কর্ত্তৃপক্ষ অর্থনীতি-বিশারদ ও রাজনীতিজ্ঞ জেমস্ উইলসন্ নামক এক সাহেবকে প্রেরণ করেন। এই বিশারদের প্রতিভা ইন্‌কাম্ ট্যাক্সের নির্দ্ধারণ ব্যতীত অন্য উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিলনা। ১৮৬১ সালে ঐ সম্বন্ধে যে কনফারেন্স বসে, তাহাতে গবর্ণমেণ্ট দুইজন দেশীয় প্রতিনিধি চাহিয়া বৃটিশ-ইণ্ডিয়ান-এসোসিয়েশনের সহায়তা চাহিলে বাবু রমানাথ ঠাকুর ও দিগম্বর মিত্রই উপযুক্ত প্রতিনিধি বিবেচিত হন।

১৮৬০ সালে বাঙ্গালা দেশে সংক্রামক রোগে ভীষণ মহামারী প্রাদুর্ভূত হওয়ায়, বহুলোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতে থাকে। বর্ষাকালের শেষ ভাগে—জুলাই ও আগষ্ট মাসে এই রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। পুরাকালে ভারতবর্ষে বিসূচিকা ও পুস্কর রোগই "মড়ক রোগ" বলিয়া কথিত হইত। একালে কলেরা ও বসন্তই সংক্রামক রোগ বলিয়া কথিত হইলেও বর্ত্তমান সংক্রামক রোগ একপ্রকার জ্বর বিশেষ ছিল।

কেহ ইহাকে 'নূতন জ্বর' কেহ বা "বৰ্দ্ধমান জ্বর" বলিত; কারণ ডাক্তার ইলিয়ট সাহেবের মতে এই রোগ অতি সাংঘাতিক ধরণের ইণ্টারমিটেণ্ট জ্বরের মত ছিল ও প্রথমতঃ ত্রিবেণী হইতে আরম্ভ করিয়া হুগলী নদীর পশ্চিম তীর দিয়া বৰ্দ্ধমান জিলার কাল্‌না পর্য্যন্ত এই সংক্রামক রোগ ভীষণ ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া বহুদূর বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। ১৮৬১ সালে ইহার প্রকোপ দ্বিগুণ বৰ্দ্ধিত হইয়া পশ্চিমে দ্বারবাসিনী হইতে দক্ষিণে বৰ্দ্ধমান ও পূৰ্ব্বে বারাসত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। ত্রিবেণী, হালিসহর, কাঁচড়াপাড়া অঞ্চলে ইহার প্রকোপ এত ভীষণ ছিল যে, মৃত্যুর ধ্বংসলীলা অবিরাম গতিতে চলিতে লাগিল। বহু পরিবার নিঃশেষে ধ্বংসীভূত হইল। দিগম্বরের চেষ্টায় ও বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের আবেদনে গবর্ণমেণ্ট বহু ডাক্তার ও ঔষধ প্রেরণ করিয়াও ইহা দমন করিতে পারিল না। ক্রমে সংক্রামক রোগের ধ্বংসলীলা বহুদূর বিসর্পিত হইয়া গ্রামের পর গ্রাম উজাড় করিয়া শ্মশান করিতে লাগিল—নিত্য সহস্র সহস্র অসহায় নরনারী মৃত্যুর করালগ্রাসে পড়িতে লাগিল। কালনা গ্রাম এরূপ জনশূন্য হইয়াছিল যে, কেবল শৃগাল, কুকুর ও শকুনির আবাসভূমি বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল; গৃহে গৃহে সৎকার অভাবে রাশি রাশি মৃতদেহ পড়িয়া থাকিয়া পুতিগন্ধে সেই মড়ককে আরও ভীষণতর করিয়া তুলিল। বৰ্দ্ধমানে প্রতিদিনই শত শত মৃতদেহ গরুর গাড়ী বোঝাই হইয়া নদী গর্ভে নিক্ষিপ্ত হইবার জন্য নীত হইতে লাগিল।

গবর্ণমেণ্ট কোনও প্রকারে এই ভয়াবহ মহামারী নিবারণ করিতে না পারিয়া বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের পরামর্শে মড়কের কারণ অনুসন্ধানের জন্য তিনজন মেডিকেল অফিসার, একজন সিভিলিয়ান ও দিগম্বর মিত্রকে লইয়া একটি কমিশন গঠন করেন। মহামারী অঞ্চলের অধিবাসিগণের স্বভাব ও রীতি-নীতি সম্বন্ধে তাঁহার ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা ছিল; এ কারণে অনু-সন্ধানে যথেষ্ট সহায়তা হইতে পারে বলিয়া গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে এসোসিয়েশন তাঁহারই নাম প্রেরণ করেন। কমিশনের রিপোর্টে দিগম্বরের সুযুক্তিপূর্ণ মন্তব্য প্রকাশিত হওয়ায় তাঁহার কীর্ত্তি ও যশোভাতি চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে এবং গবর্ণমেণ্টও তাঁহার অদ্ভুত প্রতিভা ও কার্য্যদক্ষতার পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হন।

ম্যালেরিয়া রোগে দিগম্বরের ঐতিহাসিক আবিষ্কার

১৮৬৪ সালে দেশব্যাপী ভয়াবহ মহামারীর কারণ অনুসন্ধানে নিযুক্ত কমিশনের সদস্যরূপে দিগম্বর নির্দ্ধারণ করেন যে, নিম্ন-ভূমির আর্দ্রতা বৃদ্ধিই সংক্রামক রোগের বহুল প্রচারের হেতু। তিনি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেন যে, মহামারী পীড়িত নিম্ন বাঙ্গালার পয়ঃপ্রণালীগুলি ধৌত হইয়া, প্রথমতঃ দূষিত পদার্থ জলের সঙ্গে নিকটস্থ ধান্যক্ষেত্রে যাইয়া উপস্থিত হয়, তৎপর উহা ক্রমশঃ খাল, বিল বাহিয়া স্রোতস্বতী নদীর সাহায্যে অর্ণব-পোতবাহী বড় বড় নদীতে যাইয়া মিলিত হয়। যখন এই প্রকার উপায়ে জল-নির্গমন-প্রণালীর ব্যাঘাত ঘটে, তখন সংক্রামক ম্যালেরিয়া রোগের বীজাণু নিকটস্থ ভূমিতে পরিব্যাপ্ত হইয়া ভয়াবহ মড়কের সৃষ্টি করে। কমিশনের রিপোর্টের পরিশিষ্টরূপে, দিগম্বর প্রথমতঃ তাঁহার নবাবিষ্কৃত theory বা মত সন্নিবিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন ; কিন্তু উহা এতদ্দেশীয় লোকের ও চিকিৎসাশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ ব্যক্তির মস্তিষ্কপ্রসূত বলিয়া উপেক্ষিত হয়।

এদিকে কিন্তু মহামারী প্রতি বৎসরই প্রাদুর্ভূত হইয়া তাঁহার নিত্য-অভ্যস্থ ধ্বংসলীলা শেষ করিয়া যাইতে লাগিল। গবর্ণমেণ্টও এই দুর্জ্ঞেয় রহস্যের তথ্যানুসন্ধানে প্রতিবৎসরই

তন্ন তন্ন পরীক্ষার জন্য ডাক্তার, স্যানিটারী কমিশনার ও বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞগণকে প্রেরণ করিয়া কোন প্রতিকার করিতে পারিলেন না। গবর্ণমেণ্টের ভ্রমাত্মক কার্য্যে সাধারণের প্রভূত অর্থ নষ্ট হইতেছে দেখিয়া অনুশোচনা করিতে করিতে দিগম্বর সমস্ত লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। মড়কের কারণ নির্ণয়ে গবর্ণমেণ্টের অনুসৃত নীতি বারম্বার বিফল হওয়াতে তাঁহার স্বীয় উদ্ভাবিত মতের উপর আরও দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল। সাধারণের মধ্যে ইহার প্রচারকল্পে তিনি পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ে কার্পণ্য করিলেন না। নিজ ব্যয়ে মড়কপীড়িত অঞ্চলে লোক প্রেরণ করিয়া অতীত ও বর্ত্তমানের স্বাস্থ্যসম্পর্কীয় ইতিহাস, সার্ভে প্ল্যান প্রস্তুত ও উহাদের জল-নিঃসরণ-প্রণালী সম্বন্ধে রিপোর্ট সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই অক্লান্ত চেষ্টায় বেঙ্গলী লিখিয়াছিলেন,—"এক নবীন সত্য প্রচারে স্বর্গীয় দেবদূতের আত্মা যেন তাঁহার শরীরে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল।" গবর্ণমেণ্টের নিকট তাঁহার প্রাথমিক চেষ্টা ফলবতী না হইলেও রোগের যাহা অবশ্য প্রতিষেধক বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, তাহার সমর্থনে তিনি পশ্চাদপদ হইলেন না। ১৭০২ হইতে ৭৩ সালে "হিন্দু পেট্রিয়ট" পত্রিকায় এ বিষয়ে অতঃপর ক্রমশঃ বহু প্রবন্ধ লিখিলেন এবং "বাঙ্গালায় সংক্রামক রোগের আদি-কারণ" নামে ঐগুলি একত্রে পুস্তিকাকারে প্রকাশ করিলেন। এই সম্বন্ধে তিনি সরকারী, বে-সরকারী, ইউরোপীয় ও দেশীয়গণের সহিত উৎসাহ ও অধ্যবসায় সহকারে পরামর্শ

করিতে লাগিলেন। লর্ড লরেন্সই সর্ব্বপ্রথম তাঁহার নবাবিষ্কৃত মতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মানিত করিয়া বলেন,—"ফলতঃ কমিশনের দেশীয় সভ্য বাবু দিগম্বর মিত্রের জলাভূমির আর্দ্রতা সম্বন্ধে নির্দ্দেশগুলি আমার মনোপ্লুত হইয়াছে। ঐ কমিশনও বলিয়াছিল যে, রেলওয়ে রাস্তাগুলিই প্রধানতঃ স্বাভাবিক পয়ঃপ্রণালীগুলির চলাচলের সুবিধা বন্ধ করিয়াছে এবং তজ্জন্যই রোগের উৎপত্তি। তদানন্তীন লেঃ গবর্ণর সার জর্জ্জ ক্যাম্পেলও তাঁহার মত সমর্থন করতঃ, ধান্যক্ষেত্র ও তৎসংলগ্ন জলাভূমিই গুলিই সংক্রামক রোগের উৎপত্তিস্থল—এই দোষস্খালন করিতে গিয়া বলেন যে, বাঙ্গালা দেশের আর্দ্র ও জলাকীর্ণ স্থানগুলিতে পৃথিবীর সকল জাতির জনবহুলতাই এই রোগের প্রকৃত কারণ। ১৮৯২ সালের ২৮ জুলাই বেলভেডিয়ারে গবর্ণমেণ্টের আহুত কন্ফারেন্সে সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাঁহার আবিষ্কৃত theory বা মত নির্ভূল বলিয়া গৃহীত হয়। এইরূপে দশবৎসর কাল তাঁহার কঠোর পরিশ্রমের পর, ডাক্তারেরা অবশেষে তাঁহার মত সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিলেন, যদিও এতাবৎকাল তাঁহারা উহার প্রতি অবজ্ঞাই প্রদর্শন করিয়া আসিতেছিলেন। গবর্ণমেণ্টও ঐমত গ্রহণ করিয়া Embankment Act পাশ হইবার সময় উহা স্বীকার করিয়া লইলেন। এইরূপে তিনি এই ঐতিহাসিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দেশবাসীর স্মৃতিপটে গভীর রেখা অঙ্কিত করিয়া গেলেন।

বাঙ্গালার এসিয়াটিক সোসাইটির বার্ষিক অধিবেশন সভাপতির অভিভাষণে ১৮৯৪ সালে ৭ই মে সার চার্লস ইলিয়ট বলেন,—"রাজা দিগম্বরই সর্ব্বপ্রথমে ম্যালেরিয়া জ্বরের subsoil moisture theoryএর প্রবর্ত্তন করেন।" রাজা বাহাদুরের মৃত্যুর পঁচিশ বৎসর পরে সার ইলিয়ট বহু বিদ্বান লোকের প্রকাশ্য সভায় তাঁহাকে এই শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন।

ব্যবস্থাপক সভায় দিগম্বর—উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ ও পারিবারিক দুর্ঘটনা

দিগম্বরের মূল্যবান কার্য্যাবলী, তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা, কার্য্যদক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তার সমাদর করিয়া ১৮৬৪ সালে গুণগ্রাহী গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত করেন। তিনি মহারাণী ভিক্টোরিয়া নামে শপথ গ্রহণ পূর্ব্বক পদোচিত কর্ত্তব্য সুসম্পাদন করিবেন, এই ঘোষণা করিয়া, ঐ সালের ১১ই নভেম্বর ব্যবস্থাপক সভায় আসন গ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্বে এই সম্মানজনক পদে যে সকল মনীষি মনোনীত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে বাবু প্রসন্ন কুমার ঠাকুর, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রামগোপাল ঘোষ ও রাজা সত্যচরণ ঘোষালের নামই সমধিক বিখ্যাত। দিগম্বর এই পদোচিত মর্য্যাদা ও সম্মান অক্ষুন্ন রাখিতে পারিয়াছিলেন; কারণ তিনি অধ্যবসায় ও কর্ম্মপ্রেরণাবলে শ্রেষ্ঠ ধনী পর্য্যায়ে উন্নীত হইয়া জীবনের উত্থান-পতনের বহু ঘটনা-পরম্পরায় অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজভক্তি পদলেহন-কারী আপ্ কোওয়াস্তের মত না হইয়া মানবোচিত সাহস, স্বাধীন চিন্তাশক্তি এবং আত্মসম্মানবোধে বিজড়িত ছিল। গবর্ণমেণ্টের দ্বারা মনোনীত হইলেও তাঁহার নৈতিক সাহস-পূর্ণ মনের বিশালতা কখনও সঙ্কোচে সঙ্কীর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই।

তিনি জানিতেন,—আইন-সভায় তিনি দেশের ও দশের প্রতিনিধি—যাহার উপরে সকলেরই চক্ষু আশা-আকাঙ্খায় নিবদ্ধ রহিয়াছে। তিনি জাতিকে কখনও নিরাশ করেন নাই। আইন সভায় তাঁহার বুদ্ধি, কর্ম্মদক্ষতা, বিনয় ও মানবত্ব বিকাশের বহু প্রমাণই তাঁহাকে যে প্রচুর প্রশংসা অর্জ্জন করিয়া দিয়াছিল, আর কিছুই তেমন পারে নাই।

১৮৬৬ সালে উড়িষ্যায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। তখন পশ্চিম বাঙ্গলা ও উড়িষ্যা একই প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার অধীনে ছিল। সুতরাং উভয় প্রদেশের স্বার্থ এক ও উড়িষ্যার অন্তর্গত কেন্দ্রপাড়া মহকুমার উঠিকুন পরগণায় দিগম্বরের বিস্তর ভূসম্পত্তি ছিল বলিয়া দুর্ভিক্ষের সংবাদ শুনিয়াই তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ দয়াপ্রবণতা ও পরদুঃখকাতরতা তাঁহাকে এতদূর ব্যথিত ও বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল যে, তিনি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া প্রজাসাধারণের শোচনীয় দুর্দ্দশা মোচনের জন্য উড়িষ্যা দেশে ছুটিয়া গেলেন। তাঁহার নিরন্ন প্রজাবর্গ দয়ার্দ্র ভূস্বামীকে নিকটে পাইয়া অনেকটা স্বস্তি অনুভব করিল। যখন এই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কথা তাঁহার কর্ণগোচর হয়, তখন এপ্রিল মাস উত্তীর্ণপ্রায়। মার্ত্তণ্ডের অনলকণাবর্ষী প্রচণ্ড উত্তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভিক্ষে উড়িষ্যার শ্মশানে যেন সর্ব্বধ্বংসী মহাকালের তাণ্ডবলীলা সুরু হইয়াছে। উড়িষ্যায় যাইয়া তিনি অসহ্য ক্ষুৎজ্বালায় বহু লোকের প্রাণনাশের সংবাদ শুনিয়া লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের নিকট এক জরুরী

তার প্রেরণ করেন। পত্রে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া গবর্ণ-মেণ্টের টনক পড়িল। সেই নিদারুণ গ্রীষ্মকালে শৈলবিহার ত্যাগ করিয়া লেঃ গবর্ণর স্বয়ং দার্জ্জিলিং হইতে প্রেসিডেন্সিতে চলিয়া আসেন। তাঁহার আগমনের দুইদিন পরেই রেভিনিউ বোর্ডের পরামর্শ সভা আহুত হইল এবং দিগম্বর মিত্র তাহাতে নিমন্ত্রিত হইয়া কর্ত্তৃপক্ষের নিকট মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় দুর্ভিক্ষের মর্ম্মদাহী চিত্র প্রকটিত করিলে অবিলম্বে প্রতিকারের ব্যবস্থা অবলম্বনের আদেশ হইল। তাঁহার উড়িষ্যা-গমন উপলক্ষে স্থানীয় সাপ্তাহিক পত্রে এই মর্ম্মে সংবাদটি প্রকাশিত হয়—"শ্রীযুক্ত বাবু দিগম্বর মিত্র "ভারতবর্ষীয় সভা"র একজন সুযোগ্য সভ্য; এবং এদেশের হিতের জন্য বহুতর পরশ্রম করিয়া অনেক বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তাঁহাকে সম্মান করিবার জন্য গত রবিবার রাত্রে এ নগরে এক মহাসভার অধিবেশন হইয়াছিল। * * * উৎকল ও বঙ্গদেশীয় হিন্দু, মুসলমান, জমিদার ও রাজকর্ম্মচারিগণ, ভোজপুরী, মাড়োয়ারী, মহাজন, বণিকগণ ও অন্যান্য নানাশ্রেণীর ভদ্রগণ এই সভা শোভিত করিয়াছিলেন। * * * বাবু দিগম্বর মিত্র যেরূপ সুযোগ্য ও পূজ্য, এখানে তাঁহার তদ্রূপ অভ্যর্থনা হইয়াছে। গুণীর গুণকীর্ত্তন অতি সুখজনক কার্য্য এবং এদেশীয় লোকেরা সেই সুখানুভব করিতে কোন প্রকারেই অক্ষম নহেন। * * * সম্প্রতি কটকে এরূপ সভা এক নূতন ব্যাপার এবং যাহাদের দ্বারা ইহার অনুষ্ঠান হইল, তাহারা সকলের ধন্যবাদের পাত্র

সন্দেহ নাই।" অনাহার-পীড়িত লোকদের অন্নদানের সংস্থান করিয়াই দিগম্বর ক্ষান্ত ছিলেন না, দুর্ভীক্ষ-পীড়িত অঞ্চলে দুই বৎসরের রাজস্ব মকুব করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়া কৃতকার্য্য হন।

১৮৭০ সালের মার্চ্চমাসে দিগম্বরের পরিবারে এক শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটে। তাঁহার একমাত্র সুযোগ্য কৃতী পুত্র গিরীশচন্দ্র মিত্র শোচনীয় আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। গিরীশচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে হাইকোর্টের স্বর্গীয় বিচারপতি সার গুরুদাস বানার্জ্জীর সঙ্গে ১৮৬৪ সালে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৮৬৭ সালে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা হাইকোর্টে উকীলরূপে প্রবিষ্ট হন। তিনি দুই বৎসর কাল এই আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়া পুনরায় ব্যারিষ্টারী পড়ার জন্য মহারাজ দুর্গাচরণ লাহার ভ্রাতা শ্যামাচরণ লাহার সমভিব্যাহারে ইংলণ্ডে গমন করেন। তথায় সুরেন্দ্রনাথ ব্যনার্জ্জীর সঙ্গে তাঁহার যথেষ্ট ঘনিষ্টতা হয়, কিন্তু সেখানকার আবহাওয়া তাঁহার স্বাস্থ্যের অনুকুল না হওয়াতে তথায় এক বৎসর কাল অতিবাহিত করিয়া তিনি ও শ্যামাচরণ উভয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১৮৭০ সালের মার্চ্চ মাসে একদা প্রাতঃকালে একটি অমিতবলশালী নূতন অশ্বের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তিনি শিয়ালদহের দিকে ভ্রমণে বাহির হন। সেই ভীষণ পশু কি একটা ব্যাপারে হঠাৎ ভীত হইয়া এরূপ চঞ্চল ও অদম্য হইয়া উঠিল যে, গিরীশচন্দ্র

তাহার পৃষ্ঠ হইতে অবতরণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যতঃ তাঁহার একটি পা হঠাৎ ঘোড়ার জিনের রেকাবে আট্‌কাইয়া গিয়া তাঁহার মস্তক নীচের দিকে পড়িয়া গেল। ভীষণপ্রকৃতির অশ্ব তাঁহাকে ঐ অবস্থাতে লইয়াই তীরবেগে ছুটিতে লাগিল। ইহাতে তাঁহার মস্তক সমস্ত রাস্তা ধরিয়া ভূমিতে ভীষণ ভাবে আঘাত প্রাপ্ত হইতে লাগিল। এক মাইলেরও অধিক রাস্তা এইভাবে দৌড়িয়া গিয়া অশ্বটী অবশেষে থামিলে গিরীশচন্দ্রের মৃত্যু-মুর্চ্ছিত দেহ বাড়ীতে আনিত হইল। পুত্রের ঈদৃশ অবস্থা দর্শনে স্নেহ-প্রবণ পিতার অন্তরে শোকের যে কি তুমুল ঝটিকা-প্রবাহ উঠিয়াছিল, তাহা অনুমান ব্যতীত বর্ণনা করা যায় না। গৃহে আনয়নের অল্পকাল পরেই গিরীশ চন্দ্রের প্রাণ-পক্ষী দেহপিঞ্জর ত্যাগ করিয়া অসীমের উদ্দেশে চলিয়া গেল। পুত্রের অভাগিনী মাতা সেই হইতে একেবারে উন্মাদিনী হইয়া গেলেন।

এই বৎসর দিগম্বর পুনরায় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত হন। অতীতে আইন-সভায় তাঁহার অনন্য-সাধারণ কার্য্যনৈপুণ্যই তাঁহার পুনর্নিয়োগের কারণ। তাঁহার নিয়োগের পর ১০ই ডিসেম্বর মাননীয় এস্‌লি ইডেন তাঁহার Drainage Bill ও Irrigation Bill দুইটি পেশ করিবার প্রস্তাব করেন। দিগম্বর বিল দুইটির বিরুদ্ধে সময়োপযোগী অতি উত্তম এক বক্তৃতা করেন। ঐ বক্তৃতায় তাঁহার দৃঢ় প্রতিকূলতামূলক

আপত্তি ঈপ্সিতফল প্রসব করিয়াছিল। কারণ বিল দুইটি কার্য্যে পরিণত না হওয়ায় সাধারণের প্রভূত অর্থ অপব্যয় হইতে রক্ষা পায়। ১৮৭২ সালে সার জর্জ্জ কেম্পবেলের শাসন কালে ব্যবস্থাপক সভায় মফঃস্বল মিউনিসিপালিটি বিল উত্থাপিত করা হয়। নামতঃ উহা দেশে স্বায়ত্বশাসন প্রবর্ত্তনের জন্য আনীত হইয়াছিল, কিন্তু কার্য্যতঃ মিউনিসিপালিটির উপর রাস্তা ও শিক্ষাকর নির্দ্ধারণই উহার উদ্দেশ্য ছিল। দিগম্বর তাঁহার সুদীর্ঘ বক্তৃতায় ঐ বিলের বিরোধিতা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, রাজনীতি, সমাজ, নীতি ও বুদ্ধিবৃত্তির দিক্ দিয়া দেশ এই বিল গ্রহণে এখনও উপযুক্ত হয় নাই। দ্বিতীয়বারের কাউন্সিল জীবনে দিগম্বর বহু মূল্যবান কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। আইন সভায় যে সকল প্রধান প্রধান সমস্যার আলোচনা হইত, তাহার প্রত্যেকটিতে তিনি বিশেষ অংশ গ্রহণ করিতেন। যখনই দরকার হইত, তিনি মীমাংসার্থে উত্থাপিত বিষয়ের প্রকৃত স্বরূপ তথ্য প্রকাশ করিয়া আপত্তি তুলিতে কখনও পশ্চাৎপদ হইতেন না। দেশ সম্বন্ধে তাঁহার সুক্ষ্ম অন্তর্দ্দৃষ্টি নিহিত জ্ঞানের দ্বারা যাহা তিনি বলিতেন, তাহাতেই গুরুত্ব আরোপিত হইত এবং সাধারণে তাঁহার প্রয়োজনীয়তার মূল্য বৃদ্ধি হইত। কান্সিলে তাঁহার কার্য্যকাল উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও গবর্ণমেণ্ট একরণে তাঁহাকে তৃতীয়বার সদস্য মনোনীত করেন। বারংবার এইরূপ সম্মান পূর্ব্বে কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই।

সামাজিক সমস্যায় দিগম্বর

আইনের দ্বারা বিধবাবিবাহের প্রবর্ত্তন ও কুলীন ব্রাহ্মণগণের বহুবিবাহ রহিত করিবার জন্য স্বনামধন্য পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা-সাগর মহাশয় সচেষ্ট হইলে দেশে তুমুল বিক্ষোভজনিত আন্দো-লনের সুত্রপাত হয়। কারণ এই সকল সামাজিক সমস্যায় ধর্ম্মো অবিচ্ছেদ্য সূত্র গ্রথিত; আইনের দ্বারা ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুমাত্রেরই অসহ্য হইয়া উঠিল। পুণ্যচেতা দিগম্বর মিত্রের চেষ্টায় বহুবিবাহরাহিত্য আইনে ত পরিণত হইলই না, এবং যথাকালে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষিত হইলে বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ প্রবর্ত্তনেও গবর্ণমেণ্ট কদাচ হিন্দু-ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতেন না।

এই আন্দোলনপ্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর ও দিগম্বর মিত্র মহা-শয়ের মধ্যে যে সংঘর্ষ হয়, সেই সম্পর্কে তাঁহার কোনও বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন,—'তুমি কি জান না যে, সেই সুবিখ্যাত বিশ্বপ্রেমিক আইনের দ্বারা বহুবিবাহ রহিত করিতে চাহিয়াছিলেন? তিনি একজন অতি উচ্চ জ্ঞানী পণ্ডিত, কিন্তু পাশ্চাত্য রাজনীতি সম্বন্ধে তাঁহার কোন ধারণাই ছিল না। তিনি তদানীন্তন লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর সার সিসিল বিডনকে এই বলিয়া বিশ্বাস করিতে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন যে, এই সংস্কার সমগ্র দেশবাসী সানন্দে গ্রহণ করিবে। গবর্ণমেণ্টের নিকট

তাঁহার নিশ্চয়তার অতি উচ্চ মূল্য ছিল। কারণ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকেই দেশের একজন পরম সম্মানিত, অতি উচ্চশিক্ষিত বিদ্বান পণ্ডিত মনে করিতেন। আমরা উভয়ে বন্ধু ছিলাম। আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, বহুবিবাহ স্বতঃই উঠিয়া যাইতেছে, কিন্তু যদি গবর্ণমেণ্টকে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে বলেন, তবে তাঁহারা ইহার কিছুই করিতে পারিবে না এবং আমরাও প্রতিকুলতাচরণ করিব। বিদ্যাসাগর তখন অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন, গবর্ণমেণ্টের সততা ও বিজ্ঞতায় তাঁহার অগাধ বিশ্বাস ছিল এবং ঐ দিক হইতে আশঙ্কার কিছু আছে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিলেন না। তখন ধর্ম্মের এই সমূহ বিপদে আমি স্থির থাকিতে না পারিয়া অবিলম্বে সার সিসিল বিডনকে বুঝাইলাম যে, গবর্ণমেণ্ট যদি ধর্ম্মের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যসূত্রে গ্রথিত হিন্দুর সামাজিক প্রথায় হস্তক্ষেপ করেন, তবে দেশময় অসন্তোষ ও গুরুতর অমঙ্গলের সৃষ্টি হইবে। সিপাহী বিদ্রোহের অল্প পরেই এই আন্দোলন হওয়ায় আমার চেষ্টা অনায়াসে ফলবতী হইল। এই ব্যাপারে বিদ্যাসাগর মহাশয় ক্রুদ্ধ হইয়া আমার প্রতি চিরকালের জন্য বিরূপ হইয়া গেলেন। তাঁহার ধারণা ছিল যে, তিনি দেশের একটি মহৎ কাজ করিতে যাইতেছিলেন এবং তাহাতে কেবল আমিই বাঁধা ছিলাম।

সতীদাহ, গঙ্গাগর্ভে শিশুহত্যা ও বৃদ্ধের গঙ্গাযাত্রা প্রভৃতি নৃশংস ও বর্ব্বরতামূলক প্রথা নিবারণে রাজা দিগম্বর মিত্র রাজা রামমোহনের সঙ্গে গবর্ণমেণ্টকে সহায়তা করিয়াছিলেন;

কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কারণে কুলীন ব্রাহ্মণের বহুবিবাহ রহিত করণের ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের বিরোধিতা করিয়াছিলেন। এই বৃহৎ সমাজ-সংস্কারের ব্যাপারে বিদ্যাসাগরেরও অকৃত-কার্য্য হইবার কারণ এই যে, তিনি প্রতিকূল ব্যাপারগুলি মোটেই চিন্তা করেন নাই। দেশে ক্রমঃবর্দ্ধমান অন্নসমস্যার দরুণ বহুবিবাহ এখন স্বতঃই উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু বিধবা-বিবাহ-আইন বিধিবদ্ধ হইলেও নারীর বৈধব্যপ্রথা এখনও যে সমাজে দৃঢ়শিকড় গাঁড়িয়া আছে এবং সর্দ্দা আইনের মতই Dead lawতে পরিণত হইয়াছে, ধর্ম্মের সহিত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধই ইহার কারণ। এক্ষেত্রে দূরদর্শী সমাজনৈতিক দিগম্বর অগাধ শাস্ত্রজ্ঞানী বিদ্যাসাগর অপেক্ষা অধিকতর সূক্ষ্ম বিবেচনার কার্য্যই করিয়াছিলেন।

কলিকাতার সেরিফ ও "রাজা"

দিগম্বর মিত্র

১৮৭২ সালে দিগম্বর বৃটিশ ইণ্ডয়ান এসোসিয়েশনের সভাপতি পদে বৃত হন। ইহার তুই বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৭৪ সালে বাঙ্গালা দেশে ভীষণ তুর্ভিক্ষ আরম্ভ হয়। এই তুর্ভিক্ষ প্রশমনের জন্য তিনি গবর্ণমেণ্টকে বহু সদ্‌যুক্তি ও পরামর্শ দান করেন, কিন্তু মানসিক পীড়ায় আক্রান্ত হওয়ায় কার্য্যতঃ, নিজে কিছু করিতে পারেন নাই। ১৮৭৫ সালে এসোসিয়েশনের ত্রয়োবিংশতি বার্ষিক অধিবেশনেও তিনি অসুস্থতার জন্য উপস্থিত হইতে না পারিলেও সভাপতির অভিভাষণ রচনা করিয়া পাঠান এবং রাজা নরেন্দ্র কৃষ্ণ তাহা সভায় পাঠ করেন। এই সময় ইম্পিরিয়েল কাউন্সিলে এসোসিয়েশনের পূর্ব্বতন সভাপতি রাজা রমানাথ ঠাকুরের কার্য্যকাল শেষ হইলে, দিগম্বর ঐ অভিভাষণে তাঁহাকে পুনরায় সভাপতি পদে বরণের জন্য অনুরোধ করিয়া তাঁহার পদত্যাগ পত্র ঘোষণা করেন। বৃটিশ ইণ্ডিয়া এসোসিয়েসন অভিজাত মহলে তৎকালেও অতি গণ্যমান্য প্রতিষ্ঠান ছিল এবং উহার সভাপতির পদলাভ অতি উচ্চ গৌরব ও সম্মানজনক বলিয়া বিবেচিত হইত। সুতরাং এসোসিয়েসনের সভাপতি পদ যাহাতে ব্রাহ্মণেতর জাতি না পায় এবং কলিকাতার কোন বিশিষ্ট রাজপরিবারেরই উহা একচেটিয়া থাকে, তজ্জন্য

এক স্বর্গীয় মহারাজা দিগম্বর মিত্রের বিরুদ্ধে দুর্ভেদ্য ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার করেন। ইহা স্বত্বেও তিনি নানাবিধ গুণগ্রাম বলে ঐ পদ অলঙ্কৃত করেন এবং রাজা রমানাথ ঠাকুরের ইম্পিরিয়েল কাউন্সিলের কার্য্যকাল উত্তীর্ণ হইলে স্বয়ং ঐ পদ তাঁহার অনুকূলে ত্যাগ করিয়া হৃদয়ের গভীর ঔদার্য্যের পরিচয় দেন।

নভেম্বর মাসে বাঙ্গালা কাউন্সিলে দিগম্বরের কার্য্যকালের অবসান হয়। এই সঙ্গে সাধারণে তাঁহার কর্ম্মজীবনেরও অবসান ঘটিত, কিন্তু পরবর্ত্তী ডিসেম্বর মাসে তিনি কলিকাতা নগরীর সেরিফের পদে নিযুক্ত হওয়ায় অবসর আর ঘটিল না। কলিকাতার মেয়র পদের মত কলিকাতার সেরিফের পদও অতি উচ্চ সম্মানজনক পদ। ১৮৭৫ সালে তিনি এই সেরিফের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনিই সর্ব্ব প্রথম বাঙ্গালী—যিনি এই সম্মানজনক পদে অধিষ্ঠিত হইবার গৌরব পাইয়াছিলেন। পর বৎসর ডিসেম্বর মাসে তাঁহার কার্য্যকালের অবসান ঘটিবার পূর্ব্বে একটি দুর্ল্লভ সুযোগ ও গর্ব্বদ্যোতক সুবিধা তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া গেল। যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলস্ তখন ভারত পরিদর্শনে আসিতেছিলেন। ভারতের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীর শুভাগমন উপলক্ষে সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্রই রাজভক্তির প্রবল তরঙ্গান্দোলন-কম্পনে এরূপ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল যে, বৃটিশ ভারতের ইতিহাসে এরূপ আর কখনও হয় নাই। ভারতের রাজধানী, বৃটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় নগরী কলিকাতায় তাঁহার যথোচিত অভ্যর্থনার জন্য আবশ্যকীয় আয়োজনার্থে ১৮৭৫ সালে ৩১শে

জুলাই যে মহতী সভা আহুত হয়, তাহাতে কলিকাতার সেরিফ দিগম্বর মিত্র এক সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন।

দিবাভাগে বিভিন্ন শোভাযাত্রা ও রাত্রে সর্ব্বত্র বিপুল আলোকমালায় সুসজ্জিতা কলিকাতা নগরী নানাবিধ আনন্দ উৎসবে মাতিয়া উঠিল। রেস্‌কোর্সের বিস্তৃত ময়দানে ভাইস-রয়ের সুসজ্জিত দরবার-পট-মণ্ডপে সাম্রাজ্যের উচ্চতম পদস্থ, প্রতিভা ও ক্ষমতাশালী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের সভায় ভাইসরয় যুবরাজের সঙ্গে ইংলণ্ডের আধিপত্য জ্ঞাপন করেন। এই মহা আরম্ভরযুক্ত সভায় অন্যান্য বহুগুণী ব্যক্তির সঙ্গে দিগম্বর মিত্র "সি, এস, আই" উপাধিতে সমলঙ্কৃত হন।

এই সম্মান লাভের পর দিগম্বর পরবর্ত্তী বৎসরে আরও এক উচ্চতম রাজকীয় সম্মান প্রাপ্ত হন। ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর ওয়ারেণ হেষ্টিংসের বাসভবন বেলডেভিয়ারে প্রায়শঃ বহু চিত্তাকর্ষক দরবার বসিয়া থাকে। ১৮৭৭ সালে ১৪ই আগষ্ট জাকজমক সহকারে তথায় এক মহতী সভার আয়োজন করিয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে "রাজা" উপাধিতে ভূষিত করেন। লেঃ গবর্ণর সার এস্‌লি ইডেন দিগম্বরের বিগত কার্য্যাবলীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়া উপাধির সনন্দ দান কালে এক সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিয়া বলেন,—

Raja.—I have much pleasure in handing to you the title of Raja which has been confered on you in recognition of your many and eminent public services. There has hardly been a single measure before the local

Government of late years, in which you have not been asked to assist with your counsel and advice, and as an old colleague., I can bear testimony to the invaluable assistance which you have always given, often at much personal inconvenience.

এই হিংসা-পরশ্রী-কাতরতাপূর্ণ বাঙ্গালা দেশে তাঁহার এই চরম সৌভাগ্য অনেক উপাধিলোলুপ হতাশ ব্যক্তির ঈর্ষার কারণ হইয়াছিল। কিন্তু তিনি জন্মগত মর্য্যাদা, সামাজিক ক্ষমতা বা গবর্ণমেণ্টকে খোসামুদের ফলে এই গৌরব লাভ করেন নাই; বস্তুতঃ নিজে "অর্জ্জন" করিয়াছিলেন। তাঁহার অমূল্য কার্য্যমুগ্ধ গবর্ণমেণ্ট স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে এই রাজ সম্মান দান করেন। সুতরাং দিগম্বর উপাধিলোলুপতার দিক দিয়া ইহা গ্রহণ না করিয়া নিজের বহুতর সদ্‌কার্য্যের সাক্ষী হিসাবে পুরস্কারস্বরূপ এই সম্মান গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আয়ব্যয় ও ট্যাক্সবিষয়ক প্রতিবাদ-সভায়

রাজা দিগম্বরের জ্বালাময়ী বক্তৃতা

রাজা দিগম্বর মিত্র রাজসৌভাগ্য লাভের সপ্তাহকাল পরে পরলোকগত মহারাজ রমানাথ ঠাকুরের স্মৃতিসভায় বক্তৃতা করেন। ইহার ছয় মাসকাল পরে কলিকাতার সেরিফ টাউন হলে ১৮৭৮ সালের ২রা মার্চ্চ শনিবার আর একটি সভা আহ্বান করেন। ইহাতে সমাজের সকল স্তরের দেড় হাজারেরও অধিক খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। অত্যধিক করভারপীড়িত দেশে ট্যাক্সের হার আরও বর্দ্ধিত করিবার প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে মিতব্যয়িতা সহকারে শাসনতন্ত্র পরিচালনা করিবার অনুরোধ করার উদ্দেশ্যেই এই সভার অধিবেশন। রাজা দিগম্বর 'ব্ল্যাক এ্যাক্ট' সভায় সর্ব্বপ্রথম সাধারণে বক্তৃতা দিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার এই বক্তৃতাই সর্ব্বশেষ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছিল, কারণ ভাষার সারল্য, ওজস্বিতা ও মর্ম্মস্পর্শিতার জন্য ইহা বিখ্যাত হইয়াছিল। আমরা নিম্নে ইহার সারাংশ উদ্ধৃত করিলাম,—

*　　*　　*　　*

সভ্যজগতের মানবকে এক ব্যক্তি ট্যাক্সদাতা জীব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং তিনি নিজেই অবশেষে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন

যে, তাঁহারা যদি সভ্যতানুমোদিত বিধিবিধানানুযায়ী জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে অবশ্যই ট্যাক্স দিতে হইবে। উন্নতি শব্দের অর্থই হইতেছে অর্থের জমাখরচ। ট্যাক্স ব্যতীত অর্থ আদায় হইতেই পারে না। যে রাজশাসনের অধীনে তাঁহারা বাস করিতে-ছেন, উহা ক্রমোন্নতিশীল, সুতরাং উহা ব্যয়সাধ্য। তাঁহারা বহিরা-ক্রমণ হইতে সুরক্ষিত ও অন্তর্বিপ্লব হইতে অভিরক্ষিত হইবার জন্য আইন ও ন্যায়বিচারের জন্য উত্তম বিচারালয়, ধনপ্রাণের নিরাপদতার জন্য সুপ্রয়োজিত আইন ও শাসন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য উপযুক্ত ও কর্ম্মঠ পুলিশ, দেশের বালকবালিকাগণের সুশিক্ষার জন্য সুষ্ঠু শিক্ষায়তন, সুরূপে গমনাগমনের জন্য 'উত্তম রাজবর্ত্ম, খাল-নদী পারাপারের নিমিত্ত সেতুসমূহ, অন্তর ও বহির্ব্বাণিজ্যের নিমিত্ত অপরাপর উপায়নিচয় এবং পার্থিব ও পারমার্থিক অভ্যুদয়ের জন্য অর্থ ব্যয় ও অন্যান্য নানাবিধ সদুপায়ের একান্ত প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন। এই সমস্তই ট্যাক্স বা শুল্কনির্দ্ধারণ দ্বারাই সম্ভবপর। তিনি বলিতেছেন যে, শুল্ক নির্দ্ধারণই সভ্য রাজতন্ত্রের অতি প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক উপকরণ; কিন্তু তাঁহাকে ইহাও সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করিতে হইতেছে যে, এই ট্যাক্স নির্দ্ধারণেরও একটা সীমা আছে। জন-প্রবাদানুসারে বলিতে গেলে বলিতে হয়, ইহাই হইতেছে সেই শেষ তৃণ—যাহা দ্বারা উষ্ট্রের পৃষ্ঠ ভঙ্গ করা হইয়াছে। যদি জনসাধারণের অর্থ ও সামর্থ্য বিবেচনা না করিয়া ট্যাক্স কেবল বৃদ্ধিই করিয়া ধরা হইতে থাকে, তাহা হইলে তাহাদের অস্তিত্ব অসম্ভব হইয়া পড়ে, তাহারা তাহাদের জীবনযাত্রা-প্রণালী হইতে উৎখাত ও উৎসাদিত হইয়া যাইবে। তাহা হইলে দেশের লক্ষ লক্ষ অধি-বাসীর দেউলিয়া শ্রেণীতে পর্য্যবসিত হইবার—ট্যাক্সরূপ যাঁতায় চূর্ণিত-বিচূর্ণিত হইবার এতদধিক আর কি বিপজ্জনক ব্যবস্থা থাকিতে পারে?

পূর্ব্বে জগৎময় একটা ভ্রান্তিপূর্ণ জনরব প্রচারিত হইতেছিল যে, ভারতবর্ষ "সোণার দেশ"—এ দেশের সোণার গাছে ঝাঁকি দিলেই সোণার ফল পড়িতে থাকে। এই প্রসিদ্ধির জন্যই—হায় ভারত !—এখানে বৈদেশিক আক্রমণকারিগণ আসিতেন—তাহাদের মনভরা আশা থাকিত যে, ভারতে গেলেই না জানি কত সোণা পাইব—এই দুরাশায় প্রলোভিত, এই দুরাকাঙ্ক্ষায় প্রণোদিত হইয়া তাঁহারা দলে দলে এদেশে আসিতেন—আসিয়া এদেশ লুণ্ঠন করিতেন। যে ইংরেজ জাতি আজ এই সোয়াশত বর্ষাবধি এই দেশ-শাসন সংরক্ষণ করিতেছেন, তাঁহারা অভিজ্ঞতা দ্বারা বিনির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন যে, ভারতবাসী দরিদ্র, অতি দরিদ্র—ভারতের লক্ষ লক্ষ—কোটী কোটি সন্তান অরুণোদয় হইতে শিশিরসিক্ত সায়ংকালাবধি মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়াও জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে না—তাহার চূণ থাকে ত পান থাকে না—ভাত থাকে ত ডাল থাকে না—বস্ত্র জোটে ত অন্ন জোটে না। ইংরেজ বুঝিয়াছেন—এই ভারতবাসীর সহিত ব্যবহারিক ভাবে নানাপ্রকারে সংশ্রব করিয়া টের পাইয়াছেন,—ভারতের সেই ধনের গল্প প্রবাদমাত্র। ভারতের তথাকথিত কোটীপতিরা —ইংলণ্ডের ও তত্রত্য অন্যস্থানের ধনীর—ইংলণ্ডের রাজকুমারোচিত চলনচর্য্যাশীল ধনীর তুলনায় নিতান্ত নগণ্য—নিতান্ত তুচ্ছ। এতদ্দেশীয় তথাকথিত ধনীরা, প্রকৃতপ্রস্তাবে কোনক্রমে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে মাত্র ;—ভারতীয় ধনীরা—যাহা লোকের থাকা প্রয়োজন, সেই পরিমাণ ধনের কিঞ্চিদধিকের মাত্র অধিকারী—তদ্ব্যতীরেকে আর অতিরিক্ত কিছুই নাই। নিঃস্বতার ইহা অপেক্ষা আর অধিক কি প্রমাণের প্রয়োজন যে দুই শত কোটি লোকের ধার্য্য ট্যাক্স শতকরা ৪৲ টাকা হিসাবে রহিয়াছে ?

তিনি স্বীকার করিতেছেন যে, গ্রেটব্রিটেনের দয়ালু শাসনাধীনে ভারতের অভ্যুদয় সংঘটিত হইয়াছে। কিন্তু সেই অভ্যুদয়—সেই উন্নতির

মাত্রা কতটুকু? ভারতবর্ষে যদি একবার দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, তবে সহস্র সহস্র লোক উৎকট দারিদ্র্য-সাগরে তরঙ্গায়িত হইতে থাকে,—আর্ত্ত দুঃস্থের তেমন হৃদয়বিদারক দৈন্য-অভাব আর বুঝি ঘটে নাই—এমন ব্যাপার হইয়া পড়ে। তিনি সভ্য ইউরোপ ও এতদ্দেশীয়গণের মাথা গুন্‌তি ট্যাক্সের হার বিবেচনা করিয়া তুলনা করিয়াছেন। দার্শনিক-তত্ত্ব হিসাবে ভাবিলে ইহা ঘোরতর সমস্যামূলক। ভাবুন দেখি একবার, ভারতের অবস্থানের কথা—ভারত কি ভাবে সংস্থিত? উড়িষ্যায় ১৮৬৭ সালে এক ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। সেই দুর্ভিক্ষের সময় তথাকার প্রায় দশ সহস্র লোক অনাহারে খাদ্যাভাবে মৃত্যুর করাল কবলে নিপতিত হয়। সেই সময়ে রপ্তানীর উপযোগী কোন যানবাহনের সুব্যবস্থা না থাকিলেও সেই সঙ্কট-মুহূর্ত্তে যদি অন্য কোন স্থান হইতে আহার্য্য বস্তু সেই স্থলে প্রেরিত হইত, তবুও তদ্দেশবাসিগণ আবশ্যক অর্থাভাবে তাহা ক্রয় করিতে সমর্থ হইত না।

১৮৭৪ সালের সেই বঙ্গ ও বিহারের দুর্ভিক্ষের সময় রপ্তানীর উপায়ের অভাব না থাকা সত্ত্বেও প্রায় লোকসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশকে জনসাধারণের বদান্যতার উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইয়াছিল। গত বৎসর মান্দ্রাজ ও বোম্বাইতেও অবিকল এতদ্রূপ ব্যাপারই সংঘটিত হইয়াছে। এতৎপ্রসঙ্গে ইহাও স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে, তথাকার লোকেরা যে পর্য্যন্ত না তাঁহাদের চেষ্টার ও সঙ্গতির শেষ সীমায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল, সে পর্য্যন্ত পরের গলগ্রহ—পরনির্ভরশীল হয় নাই। গত বর্ষের মাদ্রাজের দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে লর্ড স্যালিসবারী এক প্রকাশ্য জনসভায় তথাকার দুর্ভিক্ষের এক হৃদয়-বিদারক প্রকৃত চিত্র উদ্‌ঘাটিত করিয়াছিলেন। লর্ড মহোদয় বলিয়াছিলেন,—তাহাদের আর কিছুই ছিল না—বেচিয়া কিনিয়া, ধার করিয়া. বাঁধাবন্ধক দিয়া, ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তাহারা

সমস্ত নিঃশেষ করিয়াছিল—আমি এমন সমস্ত ঘটনার কথা শুনিয়াছি যে, তথাকার সেই দুর্দ্দশানিপীড়িত অসহায় লোকেরা তাহাদের মাথা গুঁজিবার ঠাঁই—শয়ন ঘরের ছাদখানি পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া—সর্ব্বস্বান্ত হইয়া—একান্ত অসহায় হইয়া আমাদের "সাহায্য-শিবিরের" সান্নিধ্যে উপনীত হইয়াছিল। তাহারা একেবারে কপর্দ্দকহীন—একেবারে নিঃস্ব হইয়া—যখন তাহাদের আর কোন গতিই ছিল না—সেই অনন্যোপায় অবস্থাতেই তাহারা গবর্ণমেণ্টের নিকট সাহায্যার্থীরূপে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।" এই কারণে কোন উদার শাসক-কর্ত্তৃপক্ষের কি কর্ত্তব্য যে, এই একান্ত অভাব-নিপীড়িত প্রজাগণের উপর নির্ব্বিচারে আবও ট্যাক্স ধার্য্য করেন? তাঁহাদের ট্যাক্স দিবাব ক্ষমতার ন্যায়ান্যায় বা ঔচিত্যানৌচিত্য বিবেচনা না করিয়া তাহাদিগকে আরও ট্যাক্সের ভারে জর্জ্জরিত করা কি কোন ন্যায়নিষ্ঠ, অমায়িক, উদারনৈতিক শাসকের কর্ত্তব্য? আমাদের শাসকগণ প্রকৃত প্রস্তাবে এবং বাস্তবিক প্রশংসার্হ ভাবে এই সাময়িক দুর্ভিক্ষের করাল অন্ধকারময়ী—বিভীষিকা দূরীকরণের প্রচেষ্টায় উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকেন। ইংরেজ জাতির হৃদয় তাঁহাদের প্রজামণ্ডলীর এই নিদারুণ কৃচ্ছতায় আলোড়িত হইয়াছে। তাহারা এই নিদারুণ দুর্ভিক্ষ প্রশমনের জন্য যে বিস্ময়কর অর্থরাশি প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া ভারতবর্ষ তাহাদের সমীপে অবশ্য কৃতজ্ঞপাশে বদ্ধ থাকিবে। ভবিষ্যতে যাহাতে এই প্রকার দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাবে দেশ উৎসন্ন যাইতে না পারে, তন্নিবন্ধন একটি "ফ্যামিন ইন্‌সিওরেন্স ফাণ্ড" সংস্থাপনের প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছে।

ইহাতে দুর্ভিক্ষের কতকটা নিরসন হইবে বটে! তিনি এই বলিয়া সম্প্রতি লর্ড স্যালিসবারীর মন্তব্যের প্রতি সকলেব মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া বলেন,—মাননীয় লর্ড মহোদয় মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন

যে—সাময়িক দুর্ভিক্ষ ও অভাব হইতে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় জনসাধারণের সমৃদ্ধিকালে কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখা (শুনুন শুনুন)! যদি দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলে তাহারা লোকসংখ্যায় অনেক হইয়া পড়ে, তবে তাহাদিগকে অন্যত্র গমন করিয়া বসবাস করিতে বলাই উচিত। কিন্তু যদি দেখা যায় যে, দেশের লোকের সংখ্যা খুব বেশী নহে, দেশের অন্ন জলেই তাহারা প্রতিপালিত হইতে পারিবে, তাহা হইলে তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিতে হইবে যে, তাহারা যেন তাহাদের প্রাচুর্য্যের সময়—যখন তাহাদের ঘরে খাবার ও হাতে পয়সা থাকে, সেই সময় দুর্দ্দিনের জন্য--এমনতর দুর্ভিক্ষাদির জন্য সম্ভবমত সঞ্চয় করিয়া রাখেন। দেশের উন্নতিকল্পে—সভ্যতা বৃদ্ধির ব্যপদেশে, সামাজিক উন্নতির নিমিত্ত—কুসীদ-জীবীদিগের নির্ম্মম হস্ত হইতে ত্রাণলাভাকাঙ্ক্ষায়—তাহাদের ধনজন রক্ষাকল্পে—যাহাতে দেশে পুনঃ পুনঃ এই দুঃখদৈন্য সমুপস্থিত হইতে না পারে, তজ্জন্য আয়ব্যয়ে একটু মিতাচারী হওয়া সকলেরই নিতান্ত উচিত (শুনুন, শুনুন)।" কিন্তু যাহারা এ দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞাত আছেন, তাহাদিগকে হয়ত বলিয়া দিতে হইবে না যে, এতদ্দেশীয় লোকেরা স্বদেশ ছাড়িয়া বিদেশ গমনে তত তৎপর নহে, ভারতীয়গণের পৈতৃক নিবাসের উপর এরূপ দৃঢ়মূল আসক্তি বিদ্যমান যে, তাঁহারা কোনক্রমেই সেই আসক্তির মূলোৎপাটনে সমর্থ হয় না। অপর পক্ষে এতদ্দেশীয় জনগণ ব্যয়কুণ্ঠতা ও মিতব্যয়িতার নিমিত্ত প্রসিদ্ধ। তাহাদের অভাব অতি সামান্য, অতি সহজলভ্য বস্তু—ফলমূলকন্দাশী হইয়াও, বৃক্ষপত্র ভোজন করিয়াও তাহারা জীবনধারণ করিতে পারে। তথাপি এক বৎসরের এই দুর্ঘটনা—এই অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষের কথাই তিনি বলিতে-ছেন—ইহাতেই তাহারা অনাহারে মৃত্যুর দ্বারে উপনীত হইয়াছিল। তাহারা এমন হতভাগ্য কেন বলুন দেখি? ইহার কারণ তাহারা ব্যয়

ব্যতীত সঞ্চয় করিতে পারে বড় অল্প। লর্ড স্যালিসবারী প্রাচুর্য্যের সময় এইরূপ দুর্ভিক্ষের জন্য সঞ্চয়ের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের তেমন দিন কি হয়? কখনই নয়। এমনই যখন ব্যাপার, তখন কি তাহাদের উপর আরও ট্যাক্সভার বৃদ্ধি করা সঙ্গত? বিবেচনাপূর্ণ মিতব্যয়িতা ও ব্যয়সঙ্কোচ সহকৃত দেশশাসন দ্বারাই তাহাদের তুষ্টি ভাবে গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহোপযোগী ব্যবস্থা করিয়া দেওয়াই কি কর্ত্তব্য নয়? (শুনুন, শুনুন)। কোথায় কোথায় ব্যয় সংক্ষেপ করা সম্ভব? তিনি একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারেন না—সে কথাটি হইতেছে এই যে, তাঁহারা যদি গবর্ণমেণ্টের গত ১৮ বৎসরের হিসাব পরিদর্শন করেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে, যতই বেশী টাকা পাওয়া গিয়াছে, ততই বেশী ব্যয় করা হইয়াছে, আরও বেশী টাকার প্রয়োজন বলিয়া জানা গিয়াছে। "অশ্ব চিকিৎসকের" চীৎকারের মত অহর্নিশ কেবল সেই একই চীৎকার ধ্বনিত হইতেছে—"দাও, দাও।"

* * * *

গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বাপর যেমন অভাবে নিমজ্জিত ছিল, এখনও তেমনই অভাবগ্রস্ত রহিয়াছে। যে সময়ের কথা আমরা বলিতেছি, সে সময়ে কোন যুদ্ধ ছিল না, কোন রাজ্য সংযোজনার ব্যাপার ছিল না—দুর্ভিক্ষ ব্যতিরেকে অন্য কোন সঙ্কটও ছিল না—উহাতেই ১৮৬৬-৬৭ সন হইতে ১৮৭৭-৭৮ সন পর্য্যন্ত ১৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়—বৎসর বৎসর ৬৪ লক্ষ টাকা সুদ আসিতে থাকে, আয়বৃদ্ধির সহিত এই ব্যয় বৃদ্ধি ভাবিবার বিষয়। ২৮ বৎসরে ১৬ লক্ষ টাকা ব্যয় বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ১৮৭০ সালে যখন প্রাদেশিক আয়ব্যয় রক্ষার নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হয়, তখন লোকের ধারণা জন্মে যে, উহাতে মিতব্যয়িতাপূর্ণ শাসনকার্য্য পরিচালনা সম্ভব হইবে এবং উহা দ্বারা ট্যাক্সদাতারা অনেকটা রক্ষা পাইবে। কিন্তু ফলে কি

হইল? প্রাদেশিক ট্যাক্স আরও বাড়িয়া গেল—বাড়িয়া গেল বার্ষিক প্রায় পৌণে দুই লক্ষ টাকা—এ বৎসরে আরও বাড়িয়াছে—দেড় লাখ। সে সমস্ত ভার পড়িয়াছে, ভূমির উপর ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর। ইহাতে ট্যাক্সের বাস্তবিক পরিমাণ বোঝা যায় না। রাজকীয় হিসাবে সেই বহু টাকার মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্সের কোন অঙ্কপাত বা হিসাব দেখান হয় না। কিন্তু এই ট্যাক্স ট্যাক্সদাতাগণকে অত্যন্ত নিপীড়ন করিয়া থাকে। তিনি আশা করেন যে—তিনি দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন যে,—ট্যাক্সদাতারা আরও ট্যাক্স দিতে সমর্থ কিনা। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট এতদ্দেশে যে সমুদয় কল্যাণজনক সামগ্রীর অবতারণা করিয়াছেন, তজ্জন্য সকলেই অতিমাত্র কৃতজ্ঞ। কিন্তু তিনি কোন ক্রমেই গোপন করিতে পারিতেছেন না যে, দেশে এই ট্যাক্স বৃদ্ধির জন্য উত্তরোত্তর অসন্তোষের বৃদ্ধি ঘটিতেছে।

যদি সুবিচারসহকারে তাহাদের উপর এই ট্যাক্স ধার্য্য হইত, তাহা হইলেও তাঁহারা নীরব থাকিতেন—কোনক্রমে সহ্য করিতেন; **কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্ট নিজে মিতব্যয়িতার কথা শিখাইতে চেষ্টিত হইয়াও নিজেদের বেলায় শক্তিহীন হইয়া আছেন।** অতএব তিনি আশা করেন যে, এই সভা মিতব্যয়ী গভর্ণমেণ্টের নিকট তাহাদের প্রার্থনা সমুপস্থিত করিবেন,—যদি "হোম মিলিটারী চার্জ্জ' টী গভর্ণমেণ্ট মাত্রানুরূপ হ্রাস করিয়া দেন, তাহা হইলেই গভর্ণমেণ্ট যে ট্যাক্স ধার্য্য করিতেছেন, তাহার আর প্রয়োজন থাকিবে না। তাহাদিগকে এতদ্বিষয়ে স্মরণ করাইয়া দেওয়া নিতান্তই বাহুল্য যে, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টই অনায়াসে এই সমস্ত অবস্থামূলে তাহাদিগের প্রার্থনানুরূপ দুঃখ দূরীভূত করিতে পারেন। জনবুল ন্যায়পর এবং উদার—তাহাতে সন্দেহ নাই। যদি

তিনি জানিতেন যে, এতদ্দেশীয় লোকের অবস্থা কিরূপ, তাহারা কেমন দরিদ্র, কেমন নিঃসহায়, তাহা হইলে তিনি তাহাদিগের এই দুঃখ কাহিনী যে শুনিতেন না—কোন প্রতিকার যে করিতেন না—এমন বোধ হয় না। যে জাতি মুহূর্ত্তের প্রেরণায় এই গতবর্ষে এমন দান করিয়াছিলেন, সে জাতি কখনও ন্যায়বিচারে পরাঙ্মুখ হইতে পারেন না। যদি পার্লিয়া-মেণ্টের অভিপ্রায়ানুসারে ব্রিটিশ জাতির নিকট তাঁহারা তাহাদের প্রার্থনা জানাইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই ন্যায়বিচার লাভ করিবেন সন্দেহ নাই (আনন্দধ্বনি)।

এই মন্তব্যসহকারে তিনি তাঁহার প্রথম প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে— "যেহেতু, এই সভার বিবেচনাসহকৃত মত এই যে, দীর্ঘকালব্যাপী সাময়িক অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাবের গতিকে দেশময় অতিমাত্র দারিদ্র্য নিবন্ধন ইহা একান্ত প্রয়োজন যে, রাজতন্ত্রকে সাধারণ অভাব অভিযোগ বিদূরণের জন্য হয়ত মধ্যে মধ্যে নিপীড়িত হইতে হইতেছে ; তাহা হউক। কিন্তু উহা দূর করিতে দুর্ভিক্ষ বীমা করা একান্ত প্রয়োজন—আয় বুঝিয়া ব্যয়ের প্রয়োজন—মিতব্যয়িতাপূর্ণ শাসনপ্রণালী পরিচালনা আবশ্যক। দেশের লোকের উপর উপর্য্যুপরি ট্যাক্সের ভার না দিয়া এই সমস্ত কার্য্যে একান্ত নিবিষ্ট হওয়া উচিত।

অর্দ্ধ শতাব্দীরও পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের যেরূপ আর্থিক দুর্গতি ছিল, এখনও সেইরূপ আছে ; বরং পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণতর বর্দ্ধিত হইয়া এখন জ্বলন্ত সমস্যা (burning question) রূপে দাঁড়াইয়াছে এবং ব্যয়সঙ্কোচ কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ হওয়া স্বত্ত্বেও কার্য্যতঃ ব্যয়বহুল শাসনতন্ত্র মিতব্যয়িতা সহকারে পরিচালনের কোন নির্দ্দিষ্ট সুষ্ঠু পন্থা অবলম্বিত না হইয়া কেবল ট্যাক্সই বরাবর বর্দ্ধিত করা হইতেছে।

ইহাতে অত্যধিক করভারপীড়িত দেশবাসীর যেরূপ শোচনীয় দুর্দ্দশা হইতেছে, সূক্ষ্মবুদ্ধি রাজনৈতিক রাজা দিগম্বর বহু বৎসর পূর্ব্বেই তাহা বুঝিতে পারিয়া যেরূপ তীব্র ও মর্ম্মদাহী স্বরে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন,—কি আইন সভায়, কি সাধারণের সভায় এ পর্য্যন্ত কোন রাজনৈতিক খ্যাতনামা ব্যক্তিই তাহা করিতে পারেন নাই।

পরলোকে রাজা দিগম্বর মিত্র

দুর্ভাগ্যের বিষয়, রাজসৌভাগ্য লাভের পর রাজা দিগম্বর ইহলোকে আর বেশীদিন থাকিতে পারেন নাই। যুবরাজের প্রস্থানের পরই তাঁহার কর্ম্মজীবনের একেবারে অবসান ঘটে। ১৮৭৪ সাল হইতে তিনি অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী গুরু পরিশ্রম ও কর্ম্মের উত্তেজনার জন্য স্বাস্থ্যভঙ্গের দরুণ ধীরে ধীরে নানাবিধ রোগ-উপসর্গে ভূগিতে আরম্ভ করেন। শুধু কঠোর পরিশ্রমই যে তাঁহাকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছিল, তাহা নহে, তাঁহার একমাত্র সুকৃতি পুত্রের শোচনীয় মৃত্যুও তাঁহার বীর হৃদয়কে একেবারে শোকে অবসাদে দমন করিয়া দিয়াছিল। তদুপরি অধিক বয়সের বার্দ্ধক্যে স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য তাঁহার শরীর ও মনের উপর এরূপ ক্রিয়া করিয়াছিল যে, সেই হইতে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। কৃষ্ণদাস পাল বলেন, তাঁহার মন উন্মাদ ও স্মৃতিশক্তি এরূপ বিলুপ্ত হইয়াছিল যে, তিনি যদি কোন ব্যক্তি বা স্থান বিশেষের নাম ভুলিয়া যাইতেন, তবে গভীর নিশীথেও এক মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে ঐ নাম সংগ্রহের জন্য লোক প্রেরণ করিতেন। একদা তাঁহার গড়াই-পুর ও ভুঞ্জাটির সিল্ক-ফ্যাক্টরীর নাম স্মরণ না হওয়াতে তিনি গভীর রাত্রে কাশীপুর হইতে ছয় মাইল দূরবর্ত্তী নদীর অপর পারস্থিত শিবপুর গ্রামে তাঁহার বন্ধু অমৃত লাল ব্যানার্জ্জীর

নিকট ঐ নাম জানিবার জন্য লোক প্রেরণ করেন। নিয়মিত নদীস্নান ও সমুদ্র-বায়ু সেবন-মানসে তখন তিনি কাশীপুরে হুগলী নদী তীরবর্ত্তী হীরালাল শীলের উদ্যান বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন। সন্ধ্যাসমাগমে তিনি প্রত্যহ নদীতীরে ভ্রমণ করিয়া নির্ম্মল বায়ু সেবন করিতেন। এপ্রিল ও মে মাসের উত্তপ্ত দিনগুলি এরূপে নদীতীরে কাটাইয়া তিনি বর্ষারম্ভে বাড়ী আসেন এবং স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ নিরাময় না হইলেও কলিকাতার সেরিফ পদে নিযুক্ত হইয়া প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের অভ্যর্থনায় যোগদান করিয়াছিলেন।

নীরবে ভুগিতে ভুগিতে রাজা দিগম্বর ১৮৭৮ সাল উপনীত হইলেন। তখন তাঁহার ৬২ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। এই সময় সর্দ্দি ও কফজ্বরে আক্রান্ত হইয়া তিনি শয্যাশায়ী হইলেন। শরীর দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিল। তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার রোগ শেষস্তরে পৌঁছিয়া যক্ষায় পরিণত হইয়াছে এবং তিনি একপ্রকার মৃত্যু কবলিত হইয়াছেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে তাঁহার পুরাতন অতিসার রোগও তাহার শেষ আঘাত দিবার জন্য দেখা দিল। মৃত্যুর চারি দিন পূর্ব্বে তিনি সমস্ত সম্পত্তির উইল করিয়া কৃষ্ণদাস পালকে শেষ এই কথা বলেন—"আমার সময় আসিয়াছে, তোমার স্বাস্থ্যের যত্ন লইও।" পরম ধার্ম্মিক পুরুষ ছিলেন বলিয়া তিনি মৃত্যুকে ভয় না করিয়া উহাকে উচ্চতর ও শ্রেষ্ঠতর জগতের—যেখানে পার্থিব জগতের সমস্ত জীবেরই একদিন

পুনর্মিলন ঘটিবে—সেই অপার্থিব জগতের দ্বারস্বরূপ মনে করিতেন। মনের এই প্রশংসনীয় দৃঢ়তার জন্য তিনি রোগ-জীর্ণ কলেবরেও কোন প্রকার কষ্টই অনুভব করেন নাই। চিত্তের দৃঢ়তা তাঁহার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও ছিল। ১৮৭৯ সালে ১৯শে এপ্রিল রবিবার প্রাতে ৭॥ ঘটিকার সময় তাঁহার পুণ্যাত্মা ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া শূন্যে—অনন্তে বিলীন হইয়া গেল। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৩ বৎসর হইয়াছিল, স্বর্ণ-বাঙ্গালার বুকে অকস্মাৎ একটা দারুণ অশনিপাত হইয়া গেল।

মহাপ্রয়াণে লোকমত

শোকাকুল সমীরণে দিকে দিকে এই নিদারুণ শোক-সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। তাঁহার আত্মীয়, অনাত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব, পরিচিত-অপরিচিত দেশবাসীর মধ্যে একটা বুকফাটা সকরুণ শোকোচ্ছ্বাস উত্থিত হইল। তাঁহার মৃত্যু-সংবাদে চতুর্দ্দিক হইতে শোকজ্ঞাপক বিস্তর তার ও পত্র আসিতে লাগিল। তদানীন্তন লেঃ গবর্ণর সার এস্‌লি ইডেন প্রথমেই তাঁহার উইলের তত্ত্বাবধায়ক অবসরপ্রাপ্ত সবজজ মহেন্দ্র নাথ বসুকে লিখিলেন,—"প্রিয় মহাশয়, এইমাত্র আমি অতীব দুঃখের সহিত আমার পুরাতন বন্ধু রাজা দিগম্বর মিত্রের মৃত্যু সংবাদ শুনিলাম। * * তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার দেশবাসীর প্রভূত ক্ষতি হইল। তিনি তাহাদের স্বার্থ সর্ব্বদাই এরূপ স্বাধীনতা, কর্ম্মদক্ষতা অথচ তৎসঙ্গে বিনয়, অকাট্য যুক্তি ও ধৈর্য্যসহকারে সমর্থন করিতেন যে, তাঁহার মতের যথাযোগ্য বিবেচনা করা সম্যক্ নিশ্চিত ছিল। ব্যক্তিগত ভাবে আমি একজন বিশ্বস্ত ও কার্য্যদক্ষ উপদেষ্টা হারাইলাম।" ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ (২১ এপ্রিল ১৮৭৯) বলেন,—"আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত কলিকাতাবাসী—দেশীয়গণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত ও সমাদৃত রাজা দিগম্বর মিত্র বাহাদুর সি, এস, আই মহোদয়ের মৃত্যু-সংবাদ লিপিবদ্ধ করিতেছি।

* * * * ব্যবসায়ে গভীর মনোযোগ ও পরিশ্রমের ফলস্বরূপ তাঁহার সুবিস্তীর্ণ জমিদারী তাঁহার পৌত্রদ্বয় উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হইবেন। বহু বৎসর যাবত দিগম্বর মিত্রের নাম কলিকাতা জনসাধারণের সম্মুখে ছিল। দক্ষতাগুণে দেশীয় সমাজের উপর তাঁহার অদ্বিতীয় ক্ষমতা ছিল। মহারাজ রমানাথ ঠাকুরের পরই যে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশনের সভাপতি পদে তাঁহাকে বৃত করা হইয়াছিল, দেশীয় সমাজের উপর তাঁহার অসাধারণ কর্ত্তৃত্বই উহার জ্ঞাপকমাত্র। বলা বাহুল্য যে, গভীর বুদ্ধি, বিপুল জ্ঞান, অনন্যসাধারণ দক্ষতা প্রভৃতি গুণগ্রামে রাজা দিগম্বরের স্থান অনায়াসে পূর্ণ করা যাইতে পারে না। বিগত এক চতুর্থ শতাব্দী কাল ধরিয়া ভারত ও বাঙ্গলা দেশ সম্বন্ধে এমন কোন সমস্যাই ছিলনা—যাহার সহিত ব্যবস্থাপক সভার সভ্যরূপে অথবা এসোসিয়েশনের ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরূপে রাজা দিগম্বরের কীর্ত্তি বিজড়িত হয় নাই। সম্পূর্ণ আত্ম-প্রতিষ্ঠ ব্যক্তিরূপে রাজা দেশীয় সমাজের বিশেষরূপ অলঙ্কার ও উহার শ্রেষ্ঠতম উপযুক্ত ও সমাদৃত প্রতিনিধি ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে শুধু ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশনই নহে, গবর্ণমেণ্ট ও দেশের জনসাধারণও প্রভূত ক্ষতিগ্রস্ত হইল।”

সাপ্তাহিক ইংলিশম্যান পত্রিকার সম্পাদক রাজা বাহাদুরের পরলোক গমনে যে মন্তব্য প্রকাশ (২৬শে এপ্রিল, ১৮৭৯)

করেন, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত হইয়াছিল। তিনি বলেন,—"দেশীয় সমাজ ও উহার কার্য্য সম্পর্কে রাজা দিগম্বর মিত্র সি, এস, আই বাহাদুরের পরিচিত সকল ইউরোপীর ভদ্রলোকই এই সপ্তাহে তাঁহার মৃত্যুতে সাঙ্ঘাতিক ক্ষতি বোধ করিতেছেন। যত দূর কল্পনা করা সম্ভব, তিনি সাধারণ বাঙ্গালীর মত ছিলেন না। সকল বিষয়েই ন্যায়বান ও দৃঢ়চেতা ছিলেন বলিয়া তিনি কি ইউরোপায়, কি দেশীয়—কাহারও নিকট স্বকীয় মত প্রকাশে কখনও ভয় করিতেন না। ঐ সকল মত রাজা এরূপ সূক্ষ্ম তর্কশক্তি ও সুযুক্তির দ্বারা পোষকতা করিতেন যে, এজন্য ইউরোপীয়েরা তাঁহার ন্যায় অন্য কোন দেশীয় ভদ্রলোককেই এত বেশী সম্মান করিতেন না। তিনি অবনত হইতেন না বা খোসামোদও করিতেন না এবং সোজাসুজি তাঁহার মত প্রকাশ করিতেন। এজন্য প্রত্যেক ইয়োরোপীয়ই মনে করিতেন যে, তাঁহারা এমন একজন স্বভাব সিদ্ধ ভদ্রলোকের সঙ্গে ব্যবহার করিতেছেন—যাঁহার মধ্যে কোন প্রকার শঠতা নাই। প্রকাশ্যে বা গোপনে স্বর্গীয় রাজা যে সকল বদান্যতার কাজ করিয়াছেন, আমরা সে সম্বন্ধে কিছু বলিব না, কিন্তু তিনি কলিকাতার বহু স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮০ জন ছাত্রকে নিয়মিত ভরণপোষণ করিয়াছেন, শুদ্ধ একজনের ধনভাণ্ডার হইতেই ইহা অপ্রচুর ব্যয় নহে। তাঁহার মৃত্যুতে বৃটিশ ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশনেরই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ক্ষতি হইল, কারণ তিনি এসোসিয়েশনের সকল কার্য্যেরই মেরুদণ্ড স্বরূপ ছিলেন।

অমৃতবাজার পত্রিকা (২৪শে এপ্রিল ১৮৭৯) বলেন,—স্তুবিখ্যাত স্বদেশবাসী রাজা দিগম্বর মিত্র বাহাদুরের মৃত্যু সংবাদ ইতিমধ্যেই দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ** দেশে তাঁহার শূন্য স্থান কদাপি পূর্ণ হইবার নহে। রাজা দিগম্বর মিত্র একজন দার্শনিক, স্বদেশভক্ত ও বিশ্বপ্রেমিক ছিলেন। তাঁহার স্বদেশিকতায় স্বার্থপরতার লেশমাত্র ছিল না। জীবন-অপরাহ্নে তিনি কেবল দেশের উপকার সাধনের জন্যই জীবিত ছিলেন। * * স্বর্গত রাজার বুদ্ধি সম্বন্ধে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন, কারণ সাধারণতঃ ইহা সকলেরই জ্ঞাত ছিল। কিন্তু সাধারণতঃ ইহা সকলের অজ্ঞাত ছিল যে, তিনি শিশুর মত সরল ও নারীর মত কোমল-হৃদয় ছিলেন। তিনি একজন অধ্যাত্মবাদী পুরুষ ছিলেন এবং এজন্য দেশের এক শ্রেণী শিক্ষিত লোকের মত না হইয়া পরলোক ও পুনর্জ্জন্মে বিশ্বাসী ছিলেন।

সার রিচার্ড টেম্পল রাজার সর্ব্বোচ্চ প্রশংসা করিয়া বলেন,—"এই সকল পরিবারের মধ্যে রাজা দিগম্বর মিত্রই সর্ব্বাপেক্ষা কৃতী জমিদার ছিলেন। তাঁহার সমসাময়িক অন্যান্য জমিদার অপেক্ষা জমিদারী পরিচালনা ও কৃষি সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্যই উত্তমরূপ বুঝিতেন। তাঁহার মহাপ্রয়াণে বিস্তর লোকমতের মধ্যে এইগুলি অগাধ সমুদ্রে বারিবিন্দু মাত্র।

উপসংহার—চরিত্র কথা

রাজা দিগম্বর মিত্র ধনী লোকেদের মত স্থূলকায় ছিলেন না। তাঁহার শরীর উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ;—তাঁহার সদা ঈষৎ হাস্যপূর্ণ মুখচ্ছবি দেখিলে মনে হইত, তিনি পরম অমায়িক, উদার দেবচরিত্র পুরুষ—যেন কত যুগ-যুগান্তরের পরিচিত বন্ধু। তাঁহার উজ্জ্বল দৃষ্টি অথচ তীক্ষ্ণ চিন্তাশীলতাপূর্ণ আয়ত-চক্ষুর্দ্বয় দেখিলে তাঁহার অন্তর্নিহিত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মনুষ্যত্বের পরিচয় পাওয়া যাইত। তাঁহার দেহ লৌহবৎ সুদৃঢ় ও দীর্ঘ এবং প্রত্যহ নিয়মিত ব্যায়াম-চর্চ্চায় প্রচুর স্বাস্থসম্পন্ন ছিল। পদব্রজে ভ্রমণই তাঁহার প্রিয় ব্যায়াম ছিল। তিনি অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনের পর ছাতা হস্তে দীর্ঘ পাঁচ ছয় মাইল প্রাতঃভ্রমণ করিয়া আসিতেন।

রাজা দিগম্বর একজন সামাজিক ব্যক্তি ছিলেন। জীবনের প্রথমে একজন বড় ব্যবসায়ী ও শেষভাগে বৃটিশ ইণ্ডিয়া এসো-সিয়েশনের একজন সভ্য ও আইন সভার সদস্যরূপে তিনি কি ইউরোপীয়, কি দেশীয়—যাহাদেরই সংস্পর্শে আসিয়াছেন, সকলেই তাঁহাকে পরম সম্মান করিতেন। কেবল অধ্যবসায়, প্রতিভা, বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা ও কঠোর পরিশ্রমে তিনি ২৪ পরগণা, যশোহর, বাখরগঞ্জ ও কটকে বিস্তর ভূ-সম্পত্তি ও প্রভূত ধনের মালিক হইয়াছিলেন। ব্যবস্থাপক সভায় তিনি

সরকারকর্ত্তৃক মনোনীত হইলেও নিজের স্বাধীন চিন্তাপ্রসূত মত প্রকাশে দ্বিধাবোধ করিতেন না। তিনি নির্ভীক, স্পষ্ট-বাদী বক্তা; কর্ত্তৃপক্ষকে তিনি সম্মান-প্রদর্শন করিতেন, কিন্তু দাসসুলভ মনোবৃত্তি তাঁহাকে সাধারণের পক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক নির্ভীক ও স্বাধীন মত প্রকাশে কখনও সংকল্পচ্যুত করিতে পারে নাই। প্রলোভনের উজ্জ্বল আলোক কখনও তাঁহার বিচারবুদ্ধিকে ঝলসিত করিতে পারে নাই। পদমর্য্যাদার দায়িত্ববোধ, সময়-নিষ্ঠা ও বিচক্ষণ দূরদর্শিতা—সর্ব্বত্রই তাঁহাকে বিজয়-গৌরবে সাফল্য-মণ্ডিত করিয়াছে—জয়লক্ষ্মী তাঁহার রাজ-ললাটে রক্ত-তিলকরেখা অঙ্কিত করিয়াছেন।

সর্ব্বজীবে দয়া ও ন্যায়পরতা প্রভৃতি গুণের ন্যায় তাহার স্বজাতিবাৎসল্য, পরোপকারব্রত ও স্বদেশপ্রীতিও অত্যন্ত প্রবল ছিল। কিরূপে দেশের উন্নতি হইবে,—কিরূপে গবর্ণ-মেণ্টের সুশাসন বর্দ্ধিত হইবে—কিরূপে দেশে সুশিক্ষার বিস্তার হইবে, এই সকল বিষয় লইয়া তিনি সর্ব্বদা বক্তৃতা ও মস্তিষ্ক-চালনা দ্বারা আন্দোলন করিতেন। শিক্ষাবিষয়ে তিনি কর্ত্তৃ-পক্ষকে নানাবিষয়ে সাহায্য করিতেন। তিনি একজন আদর্শ-বাদী সমাজসংস্কারকরূপে সতীদাহ ও শিশুহত্যা প্রভৃতি সামাজিক বর্ব্বরতামূলক কুসংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া-ছিলেন। তৎকালে শাস্ত্রানুসারে সমুদ্রযাত্রা এদেশে একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। কেহ বিলাতযাত্রার নাম করিলেও তাহার প্রতি অত্যাচার আরম্ভ হইত। সামাজিক লাঞ্ছনার ভয়ে কেহ

সুদূর সাগরপারে শিক্ষালাভের জন্য যাইতে বড় একটা সাহস করিত না। রাজা দিগম্বর তাঁহার একমাত্র পুত্র হাইকোর্টের উকিল কুমার গিরীশচন্দ্রকে ব্যারীষ্টারী পড়িবার জন্য বিলাতে প্রেরণ এবং অন্যান্য বহু যুবককে বিদ্যা-শিক্ষার জন্য বিলাত প্রেরণে উৎসাহিত করিয়া এই কুসংস্কার দেশ হইতে সমূলে উৎপাটিত করিবার চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হন। এদেশের প্রকৃতিবিরোধী পাশ্চাত্য সভ্যতা ও রীতি-নীতির মোহ-মরীচিকা-প্রলুব্ধ কতিপয় বিলাত-ফেরৎ ফেরঙ্গ ভাবাপন্ন যুবকের দ্বারা সমাজে তৎকালে প্রথমতঃ ইহার বিষময় ফল ফলিতে সুরু করিলেও ক্রমে ক্রমে গাঢ় কুজ্ঝটিকা ভেদ করিয়া বালারুণ-রশ্মি প্রকাশের ন্যায় সমুদ্রযাত্রার সুফল ক্রমশঃ ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে,—স্বাধীন দেশের স্বাধীন আবহাওয়ায় অনুপ্রাণিত বিলাতফেরৎ যুবকগণকেই—যাঁহারা এদেশে সকল বিষয়েই প্রতিষ্ঠার্জ্জন করিয়াছেন—তাঁহাদিগকেই বেশীর ভাগ দাসত্ব-নিগড়বদ্ধ ভারতের মুক্তি-আন্দোলনের পুরোভাগে নানা দুঃখ-কষ্ট-নির্য্যাতন ভোগ করিতে দেখা যাইতেছে। ইহা একপ্রকার রাজা দিগম্বরেরই দূরদর্শিতার ফল।

স্বীয় পিতার ন্যায় রাজা দিগম্বরও দীন দুঃখী, অন্ধ-অনাথ-আতুরের প্রতি করুণার্দ্র ও মুক্তহস্ত ছিলেন। ধর্ম্মশাস্ত্রে তাঁহার অগাধ নিষ্ঠা, দেব-দেবীতে তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল। হিন্দুর নিত্য-নৈমিত্তিক সন্ধ্যা-উপাসনাদি না করিয়া তিনি কোন সংসার-কর্ম্মেই লিপ্ত হইতেন না।

সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান ও ধর্ম্মশাস্ত্রে তাঁহার জ্ঞান অগাধ ছিল। তিনি নিজেই একজন কৃতী লেখক ও বাগ্মী ছিলেন এবং দরিদ্র সাহিত্যিকগণকে মুক্ত হস্তে দান করিতেন। কবি মধুসূদন দত্ত সাহিত্যচর্চ্চার জন্য রাজা দিগম্বরের নিকট হইতে প্রভুত দান পাইতেন। সাহিত্য-সেবায় তাঁহার ঈদৃশ বদান্যতা বাঙ্গালী-স্বভাবের একটি সুদুর্ল্লভ উদাহরণ। রাজার অর্থানুকুল্যে শুধু "মেঘনাদবধ কাব্য" প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা নহে, এককালীন বা মাসিক হিসাবে বহু অর্থও দানস্বরূপ কবি পাইয়াছেন, এজন্য রাজা বাহাদুরের নামে তিনি তাঁহার অমর 'মেঘনাদবধ কাব্য' উৎসর্গ করিয়া যান। হরিপ্রিয়া লক্ষ্মী-সরস্বতী উভয়ে সতীন হইলেও বাগ্দেবী চঞ্চলা কমলার উপর চিরনির্ভর-শীলা; এজন্য লক্ষ্মীর বরপুত্রগণ সরস্বতীর পুত্রগণের প্রতি মুখ তুলিয়া না চাহিলে অনেক প্রতিভাই হয়ত অনাঘ্রাত বন-কুসুমের মত লুপ্ত হইত। সুতরাং রাজা বিক্রমাদিত্যের সভায় কবি কালিদাসের প্রতিভা ও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় কবি ভারত-চন্দ্রের প্রতিভার যেরূপ বিকাশ হইয়াছে, তদ্রূপ রাজা দিগম্বর মিত্রের বিপুল দানে মাইকেল 'মধু'কবির "মধুচক্র" গৌড়জনকে নিরবধি সুধাপান করাইতেছে।

রায় বাহাদুর

কুমার মন্মথনাথ মিত্র

পূর্ব্বাভাষ

জগৎ নিত্য পরিবর্ত্তনশীল ; আজ যে বিশাল জনপদ অসংখ্য নরনারীর কলকোলাহলে মুখরিত, কালচক্রের কুটিল আবর্ত্তনে হয়ত কাল সেখানে নির্জ্জন শ্মশানপুরীর গভীর নিস্তব্ধতা খাঁ খাঁ করিতেছে। আজ যে শিশু মাতৃক্রোড় আশ্রয় করিয়া মৃদুমৃদুহসিত বদনে পরিজনের আনন্দবর্দ্ধন করিতেছে, কাল হয়ত সে মৃত্তিকা-গহ্বরে প্রোথিত বা শ্মশানানলে উৎসর্গিত হইয়াছে। অনিত্য সংসারের নিত্য পরিবর্ত্তন-লীলা—মহাকালের মহাবর্ত্তনে অঘটন-সংঘটন-পটিয়সী প্রকৃতির নিত্য বিবর্ত্তন-লীলা দেখিয়া ভগবদসাধক মায়ামুগ্ধ মানবকে উপদেশ দিতেছেন ;—

কা তবকান্তাঃ কস্তে পুত্রঃ সংসারোয়মতীব বিচিত্র।
কস্য ত্বং বা কুত আয়াত-স্তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ॥

কেবা তব কান্তা আর কে তব কুমার।
অতীব বিচিত্র এই মায়ার সংসার।

কোথা হতে আসিয়াছ, তুমি বা কাহার।
ভাবনা করহ ভাই, এই তত্ত্ব সার ॥

রাজা দিগম্বর পরলোকে চলিয়া গেলেন; তাঁহার শোক-স্মৃতি বহন করিয়া রহিল—কেবল তাঁহার বিধবা স্ত্রী, বিধবা পুত্রবধূ ও দুইটি অপোগণ্ড শিশু-পৌত্র। তাঁহার একমাত্র কৃতী পুত্র, হাইকোর্টের উকীল কুমার গিরীশচন্দ্র মিত্র তাঁহার মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এক শোচনীয় দুর্ঘটনায় অকালে পরলোক গমন করেন। তাঁহার জীবন-কথা আমরা ইতি-পূর্ব্বেই বর্ণনা করিয়াছি। কুমার গিরীশচন্দ্র যেরূপ কৃতী বিদ্বান ছিলেন, তিনি জীবিত থাকিলে রাজা দিগম্বরের বহু পরিশ্রম-লব্ধ জমিদারী-সম্পত্তি বহুলাংশে বিবর্দ্ধিত করিয়া কোন্নগর মিত্রবংশকে বঙ্গদেশে কীর্ত্তি ও যশঃ-গৌরবে মধ্যাহ্ন-ভাস্কর-প্রভায় আরও সমুজ্জ্বলতর করিয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু সর্ব্বধ্বংসী কাল তাঁহাকে অকালে কবলিত করায় স্বর্গীয় রাজা বাহাদুরের নিকট-আত্মীয়, অবসরপ্রাপ্ত সবজজ বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার সম্পত্তির ট্রাষ্টিরূপে অত্যন্ত যত্নের সহিত ঐ সুবিস্তীর্ণ জমিদারীর কার্য্য সুচারুরূপে পরিচালনা করিয়া অপোগণ্ড শিশুদ্বয়ের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে থাকেন। রাজার ট্রাষ্ট অনুসারে মিতব্যয়িতাসহকারে পরমধার্ম্মিক সবজজ মহাশয় এরূপ কৃতিত্বের সহিত জমিদারী পরিচালনা করিতে-ছিলেন যে, নূতন সম্পত্তি ক্রয়ের দ্বারা ষ্টেট্ আরও সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া উঠিল। রাজার পরলোক গমনকালে কুমারদ্বয়ের

বয়স যথাক্রমে দশ ও একাদশ বৎসর হইয়াছিল। জ্যেষ্ঠ কুমার মন্মথনাথ ও কনিষ্ঠ নরেন্দ্রনাথ যথাকালে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহাদের বিস্তৃত সম্পত্তির পরিচালন-ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া উহার আয় পূর্ব্বাপেক্ষা বহুগুণ বর্দ্ধিত করিয়াছেন। তাঁহাদের জীবন-কাহিনীও শুধু চিত্তাকর্ষক নহে, অত্যন্ত শিক্ষা-প্রদ বলিয়া আমরা এস্থলে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব।

কুমার মন্মথনাথের বিদ্যাশিক্ষা

জ্যেষ্ঠ কুমার মন্মথনাথ বিদ্যালাভের জন্য হিন্দু স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। কিন্তু শিক্ষা যাহাতে পরবর্ত্তীকালে তাঁহাকে কর্ম্মদক্ষ ও জমিদারী পরিচালনায় সুদক্ষ করিয়া (practical and useful man) করিয়া তোলে, সেই দিকে প্রধানতঃ লক্ষ্য রাখা হয়। এই কারণে তিনি বঙ্গদেশীয় অভিজাত-সম্প্রদায়ের বর্ত্তমান বংশধরগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ন্যায়পরায়ণ ও কর্ম্মদক্ষ জমিদার হইয়া উঠেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যতীত তিনি ইউরোপীয় গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিয়া ইংরাজী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। কলিকাতার বিখ্যাত বড় বড় কলেজের ইংরাজী ভাষার শ্রেষ্ঠ অধ্যাপকগণের কাহারও অপেক্ষা তাঁহার ইংরাজী ভাষায় জ্ঞান কোন প্রকারে ন্যূন ছিল না। বর্ত্তমান-কালে আমাদের দেশীয় জমিদারগণের পক্ষে আইন-সম্বন্ধেও কথঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা লাভের দরকার হয়। কারণ জমিদারী-কার্য্য পরিচালন-সম্পর্কে তাঁহাদিগকে প্রায়শঃ বহুবিধ আইন-সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। এজন্য তিনি একজন বিশেষজ্ঞ উকীলের শিক্ষাধীনে থাকিয়া আইন-সম্বন্ধেও প্রচুর জ্ঞানার্জ্জন করেন। অনেক সময় তিনি বিশেষজ্ঞ আইন-ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আইন-সম্বন্ধে এরূপ কূট তর্কবিতর্ক করিতেন যে, তাঁহাকেও একজন অভিজ্ঞ আইন-ব্যবসায়ী বলিয়াই অনেকের ভ্রম জন্মিত।

আইনে সামান্য জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে জমীদারদের Cadastral Survey প্রভৃতির জন্যও ইঞ্জিনিয়ারিং সম্বন্ধেও কিছু কিছু জ্ঞান থাকা দরকার। এই জন্য তিনি ঐ বিষয়েও বিস্তর পুস্তকাদি অধ্যয়ন করিয়া প্রচুর জ্ঞানার্জ্জন করেন। ব্যবসায়ার্থে যে সকল ব্যবসায়ী ইঞ্জিনিয়ার ও বিল্ডিং-কণ্ট্রাক্টরের সঙ্গে তাঁহার এই বিষয়ে কথোপকথন হইত, তাহারা তাঁহার ইঞ্জিনিয়ারিং সম্বন্ধে বিস্তর জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া যাইত। তাঁহার গৃহ-লাইব্রেরীতে ভাস্কর ও স্থপতি বিদ্যাবিষয়ক বহু পুস্তক দেখিতে যায়। এইরূপে সর্ব্বপ্রকারে শিক্ষালাভ করিয়াই তিনি ষ্টেটের পরিচালন ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার জমিদারী-জীবনের প্রত্যেক স্তরে এরূপ অদ্ভুত কৌশল ও কর্ম্মদক্ষতার পরিচয় দেন যে, তাঁহার সমসাময়িক জমিদারবর্গের নিকট জমিদারী-শাসন-সংক্রান্ত তাঁহার সমস্ত কার্য্যাবলীই দৃষ্টান্তস্বরূপ ছিল।

জমিদারী-শাসনের সৌকার্য্যার্থে তিনি যে এই কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট বিষয়েই শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, তাহা নহে। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের নানা শাখা-প্রশাখায় তিনি প্রভূত জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তিনি নানা স্থান হইতে মূল্যবান গ্রন্থসকল সংগ্রহ করিয়া গৃহ-লাইব্রেরীর আলমিরাসমূহ সুসজ্জিত করিয়াছিলেন।

জন-আন্দোলনে কুমার মন্মথনাথ ও তাঁহার বদান্যতা-ধর্ম্ম

রাজা দিগম্বর মিত্রের মত কুমার মন্মথনাথের কর্ম্মজীবনও দয়া, দাক্ষিণ্য, পরোপকার প্রভৃতি সদ্‌গুণগ্রাম ও দেশহিতকর অনুষ্ঠানে পূর্ণ।

কর্ম্মজীবনের প্রারম্ভেই তিনি জন-আন্দোলনে সহায়তা করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়া পরম সন্তোষের সহিত উহাতে যোগদান করেন। তখন দেশব্যাপী সহবাস-সম্মতির বয়স-নির্দ্ধারণ বিল লইয়া আন্দোলন-স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল। শাস্ত্রাচার-বর্জ্জিত নব্য সংস্কারকদলের এই ব্যাপারে গোঁড়া হিন্দু-সম্প্রদায় ক্ষোভে ও রোষে ক্ষেপিয়া উঠিয়া তখন বিলের প্রতিবাদ ও বিরুদ্ধাচরণ করিতেছিল এবং শাস্ত্রগত আপত্তি জ্ঞাপনের জন্য দিকে দিকে বহু সভাসমিতির অনুষ্ঠান করিতেছিল। শোভাবাজারের পরলোকগত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব ও তাঁহার ভ্রাতা মহারাজ-কুমার নীলকৃষ্ণ দেব এই ব্যাপারে অগ্রগণী হইয়া গোঁড়া-সম্প্রদায়ভুক্ত শাস্ত্রজ্ঞ-পণ্ডিতগণের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া কুমার মন্মথনাথকে সহযোগীতার জন্য আহ্বান করেন। সেই হইতে এমন কোন জন-আন্দোলনই ছিল না, যাহাতে কুমার বাহাদুর যোগদান করেন নাই। সাধারণের জন্য তিনি যে সকল কর্ম্ম করিতেন, তাহার বিশেষত্ব এই ছিল

যে, যদিও তিনি সমৃদ্ধ ধনী রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া অভিজাত-আবেষ্টনীর মধ্যে পবিবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন, তথাপি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যক্তিদিগের জন্য চুম্বক পাথরের ন্যায় তাঁহার প্রকৃতি ও চরিত্রগত এরূপ একটা আকর্ষণ ছিল যে, তিনি ঐ সম্প্রদায়ের লোকদিগের সঙ্গে সমপর্য্যায়ে ও অসঙ্কোচে মেলা-মেশা করিতে গভীর আনন্দ অনুভব করিতেন। তাঁহাকে জমিদারবর্গের মজলিস-বৈঠকে যেমন পাওয়া যাইত, তদ্রূপ নিয়ত সাধারণ দরিদ্র-সমাজেরও সংস্রবে আসিতে তাঁহাকে দেখা যাইত। তিনি বঙ্গীয় জমিদার সভার সভ্য ও সেই সঙ্গে ভারতবর্ষীয় সভারও সভ্যশ্রেণীভুক্ত ছিলেন। এই দুই প্রতিষ্ঠানের সংস্রবে থাকিয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থ-সংরক্ষণের ও দবিদ্রের অভাব মোচনের জন্য তাঁহার পরদুঃখ-কাতর দয়ার্দ্রচিত্ত হইতে সতত সহানুভূতি সূচক "সাড়া" পাওয়া যাইত।

সানুজ কুমার মন্মথনাথ পূর্ব্বপুরুষগণের চিরাচরিত বদান্যতা-ধর্ম্মের উপাসক ছিলেন। তাঁহাদের মিত্রবংশের ইতিহাস আলোচনায় দেখা যায় যে, রাজা দিগম্বর মিত্রের পিতা শিবচন্দ্র এই দানধর্ম্ম অনুষ্ঠানের জন্যই নিজের আয় ব্যতীত উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত পৈতৃক পঞ্চাশ সহস্র টাকাও হারাইয়া একপ্রকার নিঃস্ব দরিদ্র হইয়া গিয়াছিলেন, তবুও তাঁহার সময় হইতে অধুনা পর্য্যন্ত পুরুষানুক্রমে এই দানধর্ম্মের সম্যক্ অনুষ্ঠানে বংশে কেহই কার্পণ্য প্রকাশ করেন নাই।

কলিকাতার এক হিন্দু-অনাথ-আশ্রমের ভাইস-প্রেসিডেণ্টরূপে কুমার বাহাদুর ঐ আশ্রমে ১৫০০০৲ টাকা মূল্যের ২৩ কাটা জমি দান করেন। পূর্ব্ববঙ্গের দুর্ভিক্ষ-প্রশমনের জন্য রিলিফ ফাণ্ডে অনুজ কুমার নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে দশ হাজার টাকা দান করেন। কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয় ও সহরের অন্যান্য দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলি কুমারদ্বয়ের নিকট হইতে প্রচুর আর্থিক সাহায্য পাইয়াছেন। উভয় ভ্রাতাই স্বর্গীয় পিতামহের পবিত্র স্মৃতি অনুক্ষণ হৃদয়ে ধারণ করিয়া দরিদ্র ছাত্রদিগের প্রতি তাঁহার অনুষ্ঠিত বদান্যতা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে ও নিয়মিতরূপে বহন করিতেছেন। এই বদান্যতার প্রতি তাঁহাদের বিশেষ রূপ মনোযোগ আকৃষ্ট হইবার আরও একটি কারণ এই যে, ইহা তাঁহাদের স্বর্গীয় পিতৃদেবের পবিত্র স্মৃতি বহন করিতেছে; কারণ তিনি জীবিতকালে দরিদ্র ছাত্রগণের অভাব-অনটনের প্রতিকারকল্পে সবিশেষ চেষ্টাপরায়ণ ছিলেন। এবং এইজন্য তাঁহার স্নেহ-প্রাণ পিতা স্বর্গীয় রাজা বাহাদুর বদান্যতা-ধর্ম্মের ভিতর দিয়া অকালে কাল-কবলিত পুত্রের মর্ম্মন্তুদ শোক-স্মৃতি বিস্মৃত হইবার জন্য তাঁহার জীবিতকালের ঐ চেষ্টা ফলবতী করেন। এই বদান্যতা আবহমানকাল স্বচ্ছলতার সহিত অনুষ্ঠানের জন্য বিস্তর সম্পত্তির কতকাংশ পৃথক করিয়া দেওয়া হইয়াছে—যাহাতে এই সম্পত্তির আয় হইতেই এই সদ্ব্যয়-কার্য্য চিরকাল সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে।

অধিকন্তু উভয় কুমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের পবিত্র স্মৃতি অক্ষুণ্ণ ও চিরস্থায়ী রাখিবার জন্য "গিরিশচন্দ্র-দাতব্য-ঔষধালয়" নামে এক দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছেন। এই ঔষধালয় হইতে বেতনভোগী কবিরাজের অধ্যক্ষতায় আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রমতে প্রত্যহ শতাধিক রোগীকে ব্যবস্থাপত্র ও দেশীয় ঔষধাবলী প্রদান করা হয়। তিন মাস অন্তর দাতব্য চিকিৎসা-লয়ের কার্য্যাবলী পরীক্ষার জন্য কলিকাতা সহরের শ্রেষ্ঠতম কবিরাজগণকে লইয়া গঠিত কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির বৈঠক বসে। এস্থলে বলা অপ্রসঙ্গিক হইবে না যে, এই আয়ুর্ব্বেদীয় ডিস্পেন্সারী সহরের এক অভিনব চিকিৎসালয় ও একমাত্র দাতব্য-প্রতিষ্ঠান। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ-পরম্পরায় আচরিত স্বভাবসিদ্ধ বদান্যতাগুণে উভয় ভ্রাতাই মুক্ত হস্তে প্রয়োজনীয় সাধারণ-প্রতিষ্ঠানে ও জনসাধারণের প্রয়োজনীয় কার্য্য-নির্ব্বাহার্থে প্রচুর দান ও চাঁদা দিয়া সুখানুভব করিয়া থাকেন। প্রপিতামহ ও পিতামহের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তাঁহারা প্রতি বৎসর চারিটি বৃত্তির বন্দোবস্ত করিয়া পূর্ব্বপুরুষের বাস-ভূমি কোন্নগর হাই স্কুলের উন্নতিসাধন করিয়া দিয়াছেন। বলাবাহুল্য যে, স্বর্গীয় সব জজ মহেন্দ্রনাথ বসুর কার্য্যকাল ও কুমারদ্বয়ের সাবালকত্ব প্রাপ্তির পর হইতে উভয়ের কার্য্যকাল পর্য্যন্ত রাজা বাহাদুরের ষ্টেট্ হইতে এযাবৎ বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত বিভিন্ন দানে ও চাঁদায় সর্ব্বসাকুল্যে তিন লক্ষ টাকার উপর ব্যয়িত হইয়াছে। সবজজ মহাশয়ের কার্য্যকাল হইতে

১৯০৫ সাল পর্য্যন্ত রাজদপ্তরের পুরাতন খাতাপত্র দৃষ্টে দানের যে হিসাব-তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা হইতে উহা প্রমাণিত হয়।

কুমার মন্মথনাথ বিপুল ধনশালী হইয়াও নির্ব্বিরোধী, শান্ত, সংস্বভাববিশিষ্ট, ধর্ম্মভীরু ও নিরতিশয় বিনীত ছিলেন। সততা, ন্যায়নিষ্ঠা ধর্ম্মপরায়ণতা ও দায়িত্বজ্ঞান তাঁহার হৃদয়ে অত্যন্ত প্রবল ছিন। এই সকল গুণের একত্র সমাবেশে তিনি একজন আদর্শ জমিদার হইয়া জমিদারী সম্পত্তি বহুলাংশে বর্দ্ধিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং ধনমদে মত্ত না হইয়া উপরিউক্ত বহু সদনুষ্ঠানে অর্থের সদ্ব্যবহার করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়াছেন!

কায়স্থ-সভায় কুমার মন্মথনাথ মিত্র

সঙ্গীতকলার পৃষ্ঠপোষকতা

কুমার মন্মথনাথ পূর্ব্ববর্ণিত দুইটি রাজনৈতিক সমিতি ব্যতীত আরও বহুবিধ সদ্‌প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত ছিলেন। প্রধানতঃ কায়স্থ-সভার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহা একটি ধর্ম্মনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার বিভিন্ন শাখার মধ্যে সামাজিক, নৈতিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় উন্নতিসাধনই ইহার উদ্দেশ্য। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে এই সভা কায়স্থ জাতির মধ্যে উন্নয়নাদি ক্ষত্রিয়াচারমূলক বহু সামাজিক বিপ্লব আনয়ন করিয়াছে। সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে, সাধারণ প্রতিষ্ঠানগুলির কৃতকার্য্যতা কয়েকজনের ব্যক্তিগত চেষ্টা ও উদ্যমের উপরেই নির্ভর করে এবং এই কয়েকজনের উপরেই পরিশ্রমের ভার ন্যস্ত হইয়া থাকে। কুমার রায় মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর অনারারী সেক্রেটারী ও পরে সভাপতিরূপে কায়স্থ-সভার উদ্দেশ্য জনপ্রিয় করিয়া তুলিবার জন্য এতই কঠোর পরিশ্রম করিয়াছিলেন যে, যখন কায়স্থ-জাতির ইতিহাস লিখিত হইবে, ঐতিহাসিকগণ তখন তাঁহার স্থান অতি উর্দ্ধেই নির্দ্দেশ করিবেন। রাজা দিগম্বর মিত্রের জীবন-কথার সূচনায় বলা হইয়াছে, পূর্ব্বকালের ক্ষত্রিয় জাতি কালক্রমে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অপকর্ষতাহেতু

মসীজীবি কায়স্থকুলে পরিগণিত হইয়াছে—বহু প্রত্নতাত্ত্বিক জাতিতত্ত্ববিদ লেখক বহুবিধ গবেষণা দ্বারা এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। এখনও আর্য্যজাতির এই অধঃপতনের যুগে যে সকল মহৎ ব্যক্তি কায়স্থ-জাতিতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া ক্ষত্রিয়ত্বের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন, সুসংবদ্ধভাবে তাহার কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে গেলে এক বিরাট মহাভারত রচিত হইতে পারে। এই ধর্ম্মমূলক সামাজিক প্রতিষ্ঠান হইতে আত্ম-বিস্মৃত কায়স্থ-জাতির মধ্যে ক্ষত্রিয়ের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি ও জীবন-যাত্রা প্রণালী প্রভৃতি শিক্ষা দিবার যে চেষ্টা হয়, তাহাতে কুমার মন্মথনাথ স্বজাতির উন্নতিকল্পে বিশেষ প্রশংসনীয় কার্য্যকরী অংশ গ্রহণপুর্ব্বক যে বিপুল শ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার স্বধর্ম্মে নিষ্ঠা ও স্বজাতি-বাৎসল্যেরই জ্বলন্ত পরিচয় পাওয়া যায়।

কায়স্থ-সভার মত কুমার মন্মথনাথ "ভারতবর্ষীয় সঙ্গীত-সমাজের" জন্যও যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। সমাজের নামেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সঙ্গীতকলার উৎকর্ষ, সঙ্গীতের প্রতি উৎসাহ ও উন্নত প্রণালীতে নাটকীয় রুচির সৃষ্টির জন্যই সমাজের উদ্ভব। শেষোক্ত উদ্দেশ্য অতি আশ্চর্য্যরূপে ফলদায়ক হইয়া-ছিল। পূর্ব্ববঙ্গ দুর্ভিক্ষের সময় এই সমাজ "রিজিয়া" নাটক অভিনয় করিয়া ১৫৪৬৲ টাকা দৈন্যদুর্দ্দশা-পীড়িতদের সাহায্যার্থে 'রিলিফ ফাণ্ডে' দান করে। কুমার মন্মথনাথ ঐ রিলিফ ফাণ্ডের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। ইহা ব্যতীত সমাজের আরও বহুতর

উদ্দেশ্য ছিল। তন্মধ্যে দেশের অভিজাত-সম্প্রদায়ের সঙ্গে বৃহৎ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নৈতিক, বন্ধুসদৃশ সহানুভূতিসূচক একতা ঘনিষ্টতর করিয়া তোলাই—ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সঙ্গীতে মুগ্ধ না হয় কে? বিষধর সর্প—যাহার মারাত্মক দংশনে জীবের ভবলীলা সাঙ্গ হয়, সেও যেমন কিছুকালের জন্য ঊর্দ্ধফণা সঙ্গীতের মোহন স্বর শ্রবণ করে, তেমনই জনহীন গহনবনে যে তপস্বী ভগবানের ধ্যানে নিবিষ্টচিত্ত, সঙ্গীতের স্বর-লহরী তাঁহারও প্রিয়। সুতরাং সঙ্গীতের ভিতর দিয়া এই সমাজ এই দুই ভিন্ন রুচির ও ভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে মৈত্রী, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করিয়া তুলিতে পারিয়াছিল।

কুমার মন্মথনাথ

কুমার নরেন্দ্রনাথ
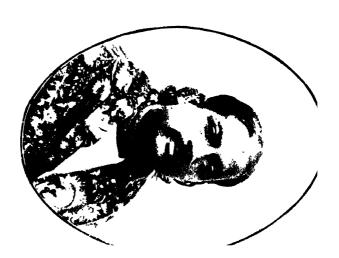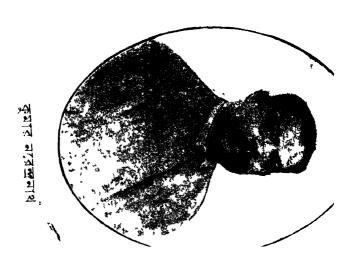
পূর্ব্ববঙ্গের দুর্ভিক্ষ দমনে মন্মথনাথ

কুমাব মন্মথনাথ বঙ্গীয় জমিদার-সভার সভ্যশ্রেণী হইতে ক্রমে সহকাবী সভাপতি পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। এই পদে থাকিয়া তিনি তৎকালীন বহুবিধ রাজনৈতিক ও সামাজিক জটিল সমস্যায় অগ্রগণী হইয়া দেশবাসীব নিকট ভক্তি ও শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছেন।

এই সময় স্বদেশী-আন্দোলন বাঙ্গালা দেশে এক নূতন জীবনীশক্তির সঞ্চার করিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি কবে। বঙ্গবিচ্ছেদ আর জোড়া লাগিবেন না বলিয়া Secretary of state for India যে ঘোষণা প্রচার করেন, তাহা সমস্ত বাঙ্গালী জাতিকে ঐক্যমন্ত্রে উদ্দীপিত করিয়াছিল। তখন দেশে শ্রমশিল্পের উন্নতির জন্য দেশাত্মবোধে উদ্দীপিত যে 'নেশানেল ফাণ্ড' বা জাতীয় ভাণ্ডারের সৃষ্টি হয়, কুমার বাহাদুর তাহার পৃষ্ঠপোষক ও কোষাধ্যক্ষ ছিলেন এবং দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা কবিয়া চাঁদা সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং এই সময়ে দেশমান্য সুরেন্দ্রনাথ, মহাত্মা শিশিরকুমার, মহারাজ সূর্য্যকান্ত, নাটোরের মহারাজা এবং বগুড়ার নবাবসহযোগে কুমার মন্মথনাথ বঙ্গবিচ্ছেদের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন করিয়াছিলেন। অধিকন্তু সেই সময় দুর্ভিক্ষের দারুণ প্রকোপে পূর্ব্ববঙ্গে, ঘরে ঘরে অসহ্য ক্ষুৎজ্বালায় পীড়িত বুভুক্ষিতদের আর্ত্তনাদে

আকাশ-বাতাস মুখরিত হইয়া উঠে; সেই সুদূর দেশের ক্ষুধাতুরদের মুখে অন্নদানের জন্য বিলাসনগরী কলিকাতার বুকে আজন্ম সুখের ক্রোড়ে বর্দ্ধিত হইয়াও কুমারের প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। দুর্ভিক্ষের প্রকোপ প্রশমনের জন্য কুমার বাহাদুর যে কঠোর পরিশ্রম করেন, দেশীয় সকল সংবাদপত্রের স্তম্ভেই তাহার ভূয়সী প্রশংসা-বাণী প্রকাশিত হয়। ১৯০৬ সালে ২১শে জুন "বেঙ্গলী"তে উচ্ছ্বাসময়ী ওজস্বিনী ভাষায় স্যার সুরেন্দ্রনাথ লিখেন ;—

"পূর্ব্ববঙ্গের দুর্ভিক্ষ-দমন-ফাণ্ডের সাহায্যার্থে চাঁদা সংগ্রহের জন্য কলিকাতায় যে চেষ্টা চলিতেছে, কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর তাহার নেতৃত্ব গ্রহণ করায় সমগ্র জাতি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। যে সকল উপাধিলোলুপ ধনী তাঁহাদের দিনগুলি উচ্চ রাজকর্ম্মচারীদের বৈঠকেই কাটাইয়া দেন এবং রাত্রে আত্মপ্রতিষ্ঠার (Self-agrandisement) চিন্তায় বিভোর থাকেন, তিনি তাহাদের দলে নহেন। যেখানে উচ্চ রাজকর্ম্মচারীকে পূজা করিবার জন্য সভা বা কর্ত্তৃপক্ষের ইঙ্গিতে কোন আন্দোলন হয়, আমরা তাঁহাকে তথায় দেখিতে পাই না। কিন্তু যেখানে সামান্যমাত্র স্বদেশহিতৈষণামূলক কার্য্যের অনুষ্ঠান, যেখানে আর্ত্ত-দুঃস্থের দুঃখ-দুর্দ্দশা মোচনের চেষ্টা,—সেইখানেই আমরা দেখি যে, কুমার মন্মথনাথ তাঁহার ধনভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া ঐ সকল জনহিতৈষণামূলক কার্য্যের বিস্তারকল্পে কার্য্য করিতেছেন। রিলিফ ফাণ্ডের সাহায্যার্থে কলিকাতার আন্দোলনকারীরা

যে তাঁহাকে ধনরক্ষকরূপে পাইয়াছেন, ইহা তাহাদের সৌভাগ্য এবং আমরা মনে করি যে, কলিকাতার ধনশালী ব্যক্তিবর্গের পক্ষে কুমার মন্মথনাথ মিত্রের দৃষ্টান্ত অনুসরণের ইহাই উপযুক্ত সময়। যদি ইহা ভাইস্‌রয় বা লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণরের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপনের আন্দোলন হইত, তবে কর্ম্মীর অভাব হইত না, কারণ তাঁহাদের কার্য্য গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পুরস্কৃত হইবে। কিন্তু যেখানে কতকগুলি মনুষ্যজীবন রক্ষা করিতে হইবে—দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে,—সেখানে আমাদের দেশীয় অভিজাত-সম্প্রদায়কে দেখা যায় না।

জনসেবা ও নবগৃহে দানধর্ম্ম

বেঙ্গলীর তদানীন্তন সম্পাদক—দেশনায়ক ও ভারতে জাতীয়তা জন্মদাতা—সার সুরেন্দ্রনাথ কুমারের এই যশোকীর্ত্তি চতুর্দ্দিকে প্রচার করেন। বাস্তবিকই কুমার মন্মথনাথ দেশমাতৃকার সেবায়, দীনদরিদ্রের ও আর্ত্ত-দুঃস্থের কল্যাণকল্পে যেরূপ কায়িক ও মানসিক পরিশ্রম করিয়া থাকেন, তাহা সাধারণতঃ ধনী শ্রেণীর মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয় না। সাধারণের হিতের জন্য তাঁহার এই কর্ম্মসাধনা বিফল হয় নাই। হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রে কর্ম্ম ও কর্ম্মফল সম্বন্ধে বহু সারগর্ভ জ্ঞাতব্য উপদেশ নিহিত আছে। ভগবান গীতায় বলিয়াছেন,—

"কর্ম্মণ্যে বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।"

"কর্ম্ম কর কিন্তু কদাচ কৃতকর্ম্মের ফলে আশা করিও না।" অর্থাৎ শ্রীভগবানের কথার তাৎপর্য্য এই যে, কর্ম্ম হইতে ফল স্বতঃই উদ্ভূত হইবে। কুমার বাহাদুর গীতোক্ত এই ভগবদ্বাক্যে অনুপ্রাণিত হইয়া যে নিষ্কাম কর্ম্মসাধনা করিয়াছিলেন, তাহা এই ভাবে ফলপ্রসূ হইল যে, তাঁহার কার্য্যদক্ষতা ও বদান্যতা প্রভৃতি গুণগ্রামে মুগ্ধ স্বদেশবাসী—কলিকাতার ৪ নং ওয়ার্ডের করদাতৃগণ, তাঁহাকে দুইবার কর্পোরেশন-কাউন্সিলে তাঁহাদের প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিলেন। কুমারবাহাদুরও কর্পোরেশনে করদাতাগণের স্বার্থরক্ষার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। সাধারণ দেশবাসী যেমন তাঁহার পুণ্যকর্ম্মের

যথোচিত সম্মানদান করিলেন, তদ্রূপ সাধারণে তাঁহার কার্য্যাবলীর পুরস্কারস্বরূপ সদাশয় গবর্ণমেণ্টও তাঁহাকে "রায় বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় দেন।

১৯০০ সালে কুমার মন্মথনাথ ঝামাপুকুরের বাসভবনে তাঁহার স্নেহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুমার নরেন্দ্রনাথকে রাখিয়া শ্যাম-পুকুরের নবনির্ম্মিত সুদৃশ্য বৃহৎ রাজ-অট্টালিকা-ভবনে উঠিয়া আসেন। এই অট্টালিকার সম্মুখস্থ প্রাচীরে নিপুণ-শিল্পীর নিপুণ তুলিকায় অঙ্কিত, বহু সুদৃশ্য কারুশিল্প ও গৃহসংলগ্ন বৃহৎ প্রাঙ্গণ নানাবিধ সুবাসিত কুসুমের নানা তরুলতা-গুল্ম ও বৃক্ষরাজির ঘন-পত্র-পল্লবে এক সুদৃশ্য মনোরম রাজোদ্যানের মত দৃষ্ট হয়; এই সৌধভবনের পার্শ্ববর্ত্তী রাজপথ দিয়া গমনকালে, ঘনসন্নিবিষ্ট গৃহরাজিপূর্ণ কলিকাতা সহরের বুকে হঠাৎ প্রকৃতির এই স্নিগ্ধ নয়নাভিরাম শোভাদর্শনে পথক্লান্ত পথিকের মনে অনির্ব্বচনীয় উৎফুল্লতার উৎস প্রবাহিত হয়। এই বাড়ীতে আসিবার পরও কুমার মন্মথনাথ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ দয়া ও বদান্যতা-ধর্ম্মপালনে কখনও পরাঙ্মুখ হন নাই। এই সময় অর্থাৎ নবগৃহে আগমনের পর হইতে ১৯৩৩ সাল পর্য্যন্ত তাঁহার জমীদারী দপ্তরের খাতাপত্র দৃষ্টে প্রমাণিত হয় যে, সর্ব্বসাকুল্যে নানাবিধ জনহিতকর অনুষ্ঠানে তিনি সাধারণে ১২৭১২৬ টাকা দান করিয়াদেশের আবালবৃদ্ধবনিতার অশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

কলিকাতার সেরিফ ও আইন-সভার সদস্য

স্বদেশের হিতসাধনা ও দেশবাসীর বহুবিধ উপকার-ব্রত অনুষ্ঠানের জন্য অদৃষ্টদেবী তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়া আরও একটি সম্মানের জয়-টীকা তাঁহার ললাটে অঙ্কিত করিয়া দিলেন। ১৯২৮ সালে তিনি কলিকাতার সেরিফ পদে নিযুক্ত হন। এই পরম গৌরবজনক পদে অধিষ্ঠিত হওয়া কলিকাতার নাগরিক-জীবনের পরম সৌভাগ্য। কিন্তু তাঁহার জীবনে সেরিফের পদপ্রাপ্তি আরও বিশেষ চরম সৌভাগ্যের কারণ হইয়াছিল এইহেতু যে, এই পদের সঙ্গে তাঁহার পরলোকগত পিতামহ রাজা দিগম্বর মিত্র সি, এস, আই বাহাদুরের পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত ছিল। বাঙ্গালীর মধ্যে রাজা দিগম্বর মিত্রই সর্ব্বপ্রথম এই সর্ব্বোচ্চ সম্মানজনক পদে অধিষ্ঠিত হইয়া নাগরিকের এই চরম গৌরবে বিমণ্ডিত হইয়াছিলেন। পিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণে কলিকাতার সেরিফরূপে কুমার মন্মথনাথ যথেষ্ট কৃতিত্বের সহিত তাঁহার কার্য্য সম্পাদন করিয়া পদোচিত মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

অতঃপর ১৯২৯ সালে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক-সভার সদস্য পদ লাভ করেন। আইন-সভাতেও তিনি স্বদেশের বহু হিতকর কার্য্যে দেশবাসীর গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন। ইহার পর হইতেই সাধারণে তাঁহার কার্য্যকলাপের

শেষ হয়। বয়োধিক্যবশতঃ নানাবিধ শারীরিক অসুস্থতার গতিকে তিনি কর্ম্মজীবন হইতে একপ্রকার অবসর গ্রহণ করিয়া ভগবদসাধনায় আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। শাস্ত্রকারের মতে হিন্দু জীবনের এই শেষ স্তরের কর্ত্তব্য—জপতপ ও ভগবানের ধ্যান-ধারণা প্রভৃতি নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠানই এখন কুমার বাহাদুরের জীবন-অপরাহ্নের তপশ্চর্য্যা-স্বরূপ হইয়াছে। শাস্ত্রে ইহাই বাণপ্রস্থ ধর্ম্ম বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

অনাথাশ্রমে পরোপকার ব্রত

পরোপকার-ব্রতই মানবজীবনের পরম ধর্ম্ম। একটি গল্প আছে যে, একদা কোন স্থবির ধনী ব্যক্তি অপরাহ্নকালে তাঁহার অট্টালিকা-প্রাঙ্গণে বসিয়া রৌদ্র সেবন করিতেছিলেন, এমন সময় এক উন্মাদ ব্যক্তি একটি পিপীলিকাধৃত মৃত পারাবত আনিয়া তাঁহাকে দেখাইয়া বলিল,—"বল দেখি, এটা কি ?" তিনি বলিলেন, "এ মৃত কপোতটি কোথা হইতে আনিলে" তখন সেই উন্মাদ ব্যঙ্গস্বরে বলিল,—"এটা কি মৃত ?" 'যে লক্ষ লক্ষ জীবের মুখে শরীর দান করিতেছে সে মৃত, আর তুমি অর্থের গদীর উপর বসিয়া জীবিত, ধিক্ তোমাকে।" সেই অপরাহ্নকালে, জীবনের সেই অপরাহ্ন-বেলায় উন্মাদের এই তীব্র শ্লেষবাণী তাঁহাকে পাগল করিয়া তুলিল। ভগবানই যেন উন্মাদের ভিতর দিয়া তাঁহাকে কঠোর পরিহাস করিল—"তিনি অগাধ ধনের মালিক হইয়া দীন-দুঃখী, অন্ধ-আতুরদের মুখে অন্ন দিয়া ভব-পারাবার-পার হইবার কোন সম্বলইত সঞ্চয় করেন নাই।" সেই হইতে তিনি দরিদ্রনারায়ণের সেবার জন্য অতিথিশালা খুলিয়া সকল ধর্ম্মের ও সকল জাতির দরিদ্র লোকদের জন্য অহোরাত্র সদাব্রত খুলিয়া দিলেন। এই ভব-পারাপার-পার হইবার সম্বল-স্বরূপ, পরম ধার্ম্মিক কুমার মন্মথনাথ ১৫০০০৲ হাজার টাকার জমি দান করতঃ "হিন্দু-অনাথ-আশ্রম"

প্রতিষ্ঠা করেন এবং ঐকান্তিক চেষ্টা ও সময়ে সময়ে এই আশ্রমের সাহায্যার্থে বহু সহস্র অর্থ দান করিয়া এই আশ্রমটিকে self supporting অর্থাৎ আত্মনির্ভরশীল করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। অধুনা কুমারবাহাদুর আশ্রমের সভাপতি দরিদ্রনারায়ণের যে সেবা করিতেছেন, তাহা তাঁহাকে নশ্বর সংসারে অবিনশ্বর কীর্ত্তি দান করিয়াছে।

জগতের সকল ধর্ম্মশাস্ত্রে, এমন কি সৃষ্টির আদিকাল হইতেই হিন্দুশাস্ত্রে দয়া, দম ও দানের মহিমা ঘোষিত হইয়াছে। এসম্বন্ধে উপনিষদে একটি সুন্দর রূপকের উল্লেখ আছে। বর্ষার ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশে যাঁহারা বিদ্যুদ্বিকাশ দেখিয়াছেন, তাঁহারা দেখিতে পাইয়াছেন যে, ঐ বিজলী-চমক একত্রে কতকগুলি 'দ' আকারের সমষ্টিগত অগ্নিলেখাবিশেষ। সৃষ্টির প্রারম্ভে আদি মেঘাড়ম্বরে যখন গুরুগম্ভীর গর্জ্জনে বিদ্যুল্লতা-চমকে এরূপ দ-দ-দ লেখা দেখিয়া বিশ্বহিতকামী দেবতামণ্ডলী সম্ভ্রমে এই লিখন-মর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিল, তখন গম্ভীর নির্ঘোষে আকাশে ধ্বনিত হইল,—"দম ;—দম ব্যতীত দেবগণের গৌরব নাই।" পুনরায় মেঘক্রোড়ে—অশনি-সম্পাতে—বিদ্যুল্লতা চমকিয়া উঠিয়া 'দ' আকারের সৃষ্টি করিলে বিশ্বহিতকামী দ্রষ্টাস্রষ্টা ঋষিগণ ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় আরণ্যক ঋষি বলিলেন,—"দান ;—দান ব্যতিরেকে মানবের পরিত্রাণ নাই।" পুনরায় মেঘক্রোড়ে ঘন-বিদ্যুৎ-চমকে দ-দ-দ আকারের সৃষ্টি হইলে দ্রষ্টাস্রষ্টা ঋষিগণ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন গম্ভীর নির্ঘোষে

উত্তর হইল—"দয়া,—দয়া বিনা দানবগণের মুক্তি নাই।" বিশ্ব-সৃষ্টির আদিকালে বিশ্বহিতার্থে আদি-মেঘের ক্রোড়ে আদি-বিদ্যুল্লতা-ক্রীড়ায় দয়া, দম ও দানের মহিমা ঘোষিত হইল এবং সেই হইতে সুরাসুর-মানবের মঙ্গলনিদান এই চিরন্তনী বাণী-ত্রয়ী ঋষিমুখে জগতে প্রচারিত হইল। উপনিষদে আরও আছে, যিনি সর্ব্বপ্রাণীতে পরমাত্মাকে দর্শন করেন এবং পর-মাত্মাতে সর্ব্বপ্রাণীকে দর্শন করেন, তিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া কর্ম্মবন্ধন হইতে সতত মুক্ত হইয়া থাকেন। সুতরাং পাপতাপপূর্ণ সংসার-নরক হইতে পরিত্রাণ লাভের উপায়স্বরূপ সর্ব্বপ্রাণীতে পরমাত্মা বা ঈশ্বরের স্বত্বা অনুভব করিয়া কুমার বাহাদুর এই দয়া ও দানধর্ম্মের অনুষ্ঠানে জন্মান্তর ও পরলোক-পথের বহু সুকৃতি-সম্বল সঞ্চয় করিয়াছেন।

কুমার মন্মথনাথের শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র. বসন্তকুমার, হেমন্ত-কুমার, শিশিরকুমার, কিরণকুমার, বিজয়কুমার ও সনৎকুমার নামে সপ্ত পুত্র ও চারি কন্যা বিদ্যমান। পুত্রগণের মধ্যে সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী বিদ্বান ও রাজা দিগম্বর মিত্র সি, এস, আই বাহাদুরের উপযুক্ত বংশধর।

শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র মিত্র এম, এল, সি

জন্ম ও বিদ্যা শিক্ষা

——:(*):——

কুমার রায় মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র মিত্র এম, এল, সি মহাশয় এখন তাঁহাদের সুবিস্তৃত জমিদারীর কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। ১৮৮৮ সালে শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র তাঁহাদের ঝামাপুকুর বাসভবনে জন্মগ্রহণ করেন। পঞ্চম বর্ষ বয়স অতিক্রম করিলে গৃহ-শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে তাঁহার বিদ্যারম্ভ হয়। শৈশবকাল হইতেই শরচ্চন্দ্রের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও মেধাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। যথাকালে তিনি হিন্দু স্কুলে বিদ্যশিক্ষার জন্য প্রেরিত হন। গত শতাব্দীর শেষ ভাগে কলিকাতায় যতগুলি স্কুল ছিল, হিন্দু স্কুলই তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠতমা বলিয়া বিবেচিত হইত। সম্পন্ন গৃহস্থের পুত্র সকল এই বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইতেন। এই বিদ্যালয়ের বহু ছাত্র উত্তরকালে রাজনীতি, শিক্ষানীতি ও অন্যান্য বিষয়ে কর্ম্মক্ষেত্রে বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন। বিশেষ সম্পন্ন ধনী গৃহস্থ না হইলে কেহ এখানে পুত্রদিগকে শিক্ষালাভের জন্য প্রেরণ

করিতেন না। শিক্ষকগণও বিশেষ যত্নের সহিত ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতেন। শ্রীযুত শরচ্চন্দ্রও তাঁহার পিতা ও খুল্লতাতের মত বাল্যকালে হিন্দু স্কুলে প্রবেশ করেন। তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, স্মরণশক্তি ও মেধা প্রথমাবধিই শিক্ষকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। কৃতি সমপাঠিগণের সঙ্গে বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া তিনি উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। উত্তরকালে যে তিনি বিশেষ উন্নতিলাভ করিবেন, তাহার আভাষ তৎকালেই পাওয়া গিয়াছিল।

এই বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করেন। কলেজ-জীবনে শরচ্চন্দ্র কঠোর পরিশ্রমী ও অধ্যয়নশীল ছাত্র ছিলেন। কলেজে অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি রসেল, লক, ষ্টিওয়ার্ট, সেক্সপীয়র, মিল্টন ও বায়রণ প্রভৃতি উচ্চ দার্শনিক ও সুকবিগণের গ্রন্থাদি পাঠ করিয়াছিলেন। ইহাতে ইংরেজী সাহিত্যে তাহার ব্যুৎপত্তি, গভীর পাণ্ডিত্য ও তৎসঙ্গে স্বাধীন চিন্তা, তর্কশক্তি ও বাগ্মীর প্রতিভা স্ফুরিত হইতে লাগিল। প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে তিনি বি, এ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইলেন। এই সময় তিনি হাইকোর্ট আইন-ব্যবসায় অবলম্বনের জন্য কোনও প্রসিদ্ধ এটর্ণি অফিসে Articled Clerk নিযুক্ত হন।

কর্ম্মজীবন ও জনসেবা

কয়েক বৎসর এটর্ণি অফিসে আইন অধ্যয়নের পর, তাঁহার পিতৃদেব কর্ত্তৃক জমিদারী কার্য্য পরিদর্শনের ভার প্রাপ্ত হইয়া, বাধ্য হইয়াই তিনি এটর্ণির ব্যবসায় অবলম্বনের আশা পরিত্যাগ করেন। এই সময় হইতেই শরচ্চন্দ্রের কর্ম্মজীবন আরম্ভ হয়। জমিদারী কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া তিনিও প্রপিতামহ রাজা দিগম্বর মিত্র হইতে পুরুষানুক্রমে অনুষ্ঠিত—দরিদ্র-নারায়ণের সেবাকল্পে বহু দানধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। শরচ্চন্দ্রের সুপরিচালন গুণে তাঁহাদের সুবিস্তীর্ণ জমিদারীর আয় পূর্ব্বাপেক্ষা বহু গুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। সুবিস্তৃত জমিদারীর দরিদ্র প্রজাবর্গ ও দরিদ্র কর্ম্মচারিগণ তাঁহার মিষ্টভাষী অমায়িক ব্যবহারে ও তাহাদের দুঃখ-দুর্দ্দশা-অভাব মোচনে তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টা, সহানুভূতি ও করুণাকণা লাভে উৎফুল্ল হইয়া নিয়ত ভগবৎসমীপে তাঁহার কল্যাণ ও দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া থাকে। শরচ্চন্দ্র তাঁহাদের জমিদারী-অঞ্চলে দেশীয় শিল্পকলা ও বহুবিধ ব্যবসায়ের জন্য প্রভূত চেষ্টা ও বিস্তর অর্থব্যয় করিয়াছেন। সহৃদয়তা ও পরোপকার প্রভৃতি গুণের ন্যায় তাঁহার ন্যায়পরায়ণতা এবং স্বদেশ-প্রীতিও অত্যন্ত প্রবল। এই জন্য এবং তিনি নিজেও বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উচ্চ শিক্ষিত বলিয়া উচ্চশিক্ষার উপকারিতা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া

তাঁহাদের জমিদারীতে ধনী-দরিদ্র নির্ব্বিশেষে প্রজাসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তারকল্পে বহু স্কুলাদি প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করিয়াছেন। চিকিৎসা শাস্ত্রেও তাঁহার প্রবল অনুরাগ আছে।

গুণী ব্যক্তির আদর সর্ব্বত্র। তাঁহার এই সকল গুণের জন্য মুগ্ধ হইয়া কলিকাতার এক নম্বর ওয়ার্ডের করদাতৃগণ তাঁহাকে কর্পোরেশনের কাউন্সিলে ১৯১৮ সালে তাঁহাদের প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র দীর্ঘ ছয় বৎসরকাল কর্পোরেশনে কাউন্সিলারের পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া যোগ্যতার সহিত কর্ত্তব্য কাজ সুসম্পন্ন করতঃ স্বীয় পিতৃদেবের মত করদাতৃগণের যথেষ্ট উপকারসাধন করিয়া ঐ অঞ্চলের প্রভূত উন্নতিসাধন করিয়াছেন। তিনি বৃটিশ ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশনের একজন সভ্য এবং প্রপিতামহ রাজা দিগম্বর মিত্র সি, আই, ই বাহাদুরের পদাঙ্ক অনুসরণে এসোসিয়েশনেরও উন্নতিকল্পে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া থাকেন। সুন্দর বন অঞ্চলে তাঁহাদের বিস্তৃত জমিদারী আছে। তথাকার প্রজাবর্গের মঙ্গল ও উন্নতিসাধন এবং জমিদারগণের স্বার্থসংরক্ষণকল্পে গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রতিনিধিত্ব করিবার সৌকর্য্যার্থে "সুন্দরবন-ল্যাণ্ড-এসোসিয়েশন" নামে গঠিত সমিতির তিনি একজন সুযোগ্য সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার এবং ঐ সভার সভাপতি তাঁহার খুল্লতাত ভ্রাতা কুমার হিরণ্যকুমার মিত্র বাহাদুরের বহু অক্লান্ত চেষ্টায় ঐ অঞ্চলে বহু উন্নতিকর কার্য্য সাধিত হইয়াছে।

দেশহিতৈষিতা ও চরিত্র-কথা

১৯৩০ সালে শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নিযুক্ত হইয়া সর্ব্বপ্রকারে রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিতও সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। জমিদারগণ সাধারণতঃ নিজেদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ও সরকারী 'খেতাবে'র লালসায় ঘৃণ্য দাসসুলভ মনোবৃত্তির পরবশ হইয়া আইন সভায় উত্থাপিত নানাবিধ সমস্যামূলক প্রস্তাবে সরকার পক্ষই অবলম্বন করিয়া থাকেন। শরচ্চন্দ্র এক্ষেত্রে কিন্তু প্রলোভনের উজ্জ্বল আলোকে স্বদেশীয়গণের প্রতি কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট না হইয়া তাঁহার পরলোকগত প্রপিতামহ নির্ভীক ও তেজস্বী রাজা দিগম্বর মিত্র ও পিতৃদেব কুমার মন্মথনাথ মিত্রের পদাঙ্ক অনুসরণে দেশবাসীর স্বার্থের দিকেই লক্ষ্য রাখিয়া দেশের অনুকুলেই কার্য্যানুবর্ত্তী হইয়া থাকেন। বাঙ্গালার অভিজাত সম্প্রদায়ের একজন উচ্চ সম্ভ্রান্ত ধনী জমিদারের পক্ষে ইহা কম স্বার্থত্যাগের কথা নহে।

সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাহিত্য সম্বন্ধীয় যে কোন সদনুষ্ঠানে শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র মিত্র যোগদান করিয়া থাকেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উচ্চ শিক্ষিত কৃতী বিদ্বান বলিয়া নিজেই নিয়মিত নানাবিধ সাহিত্য অধ্যয়ন ও আলোচনা করিয়া থাকেন এবং সাহিত্যসেবীদিগকে সমাদর করেন। তিনি যেমন

বিনয়ী, তেমনই সম্পূর্ণ নিরহঙ্কার। পূর্ব্বপুরুষগণের আচরিত দয়া, বদান্যতা, সহৃদয়তা, মিষ্টালাপ ও ভগবদ-ভক্তি প্রভৃতি গুণ-গ্রামে শরচ্চন্দ্র দেশবাসীকে মুগ্ধ করিয়াছেন। সর্ব্বাপেক্ষা শ্লাঘার বিষয় এই যে, কি কর্পোরেশন, কি ব্যবস্থাপক সভা ও কি অন্যান্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠান সমূহে তাঁহার কার্য্যকালে রাজকীয় সম্মান লাভের বহু সুযোগ আসিলেও তিনি অনায়াসে ঐ সকল প্রলোভনের মায়া ত্যাগ করিয়াছেন, কারণ তিনি নিজেকে এক-জন 'স্বদেশ-ভক্ত' বলিয়া পরিচয় দিতে গর্ব্ব ও আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। তাঁহার সাধকচিত্ত 'জননী জন্মভূমি'—সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা—বনরাজিলীলা মাতৃভমির প্রতি ভক্তি ও অনুরাগে ভরা!

কুমার নরেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর

—"ঝামাপুকুর রাজবাটী"—

——:(*):——

বঙ্গদেশে—শুধু বঙ্গদেশে কেন—সমগ্র ভারতে ঝামাপুকুর রাজবাটীর নাম লোকমুখে পরিকীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। পূণ্যতোয়া ভাগীরথী-তীরে বিশ্বেশ্বরের সাধনক্ষেত্র বারাণসী-ধামে যেমন বিশ্বেশ্বরের চরণ দর্শন করিয়া পরলোকের সম্বল সঞ্চয়ের জন্য সংসার-তাপ-ক্লিষ্ট অসংখ্য নর-নারী প্রত্যহ দেশ-দেশান্তর হইতে ছুটিয়া আসে, তেমনই কত দুঃখ-অভাব-ক্লিষ্ট অর্থী-প্রত্যর্থী রাজবাটীর ধনভাণ্ডার হইতে অভাব মোচনের দ্বারা ইহলোকের সম্বল সংগ্রহের জন্য বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ও মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলের অদূরে পরম দানবীর রাজা দিগম্বর মিত্র সি, এস, আই বাহাদুরের অক্ষয় স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া "ঝামাপুকুর রাজবাটী" আকাশ পথে সংগর্ব্বে মস্তকোত্তলন করিয়া তাঁহার কীর্ত্তিরাশি ঘোষণা করিতেছে। অর্দ্ধ শতাব্দী হইতে চলিল, স্বর্গীয় রাজার পুণ্য-

স্মৃতি-বিজড়িত এই তীর্থমন্দিরে বসিয়া তাঁহার সুযোগ্য পৌত্র কুমার নরেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাতুর প্রত্যহ বহু প্রার্থীর অভাব পূরণ করিয়া থাকেন। বিপন্ন-দরিদ্র ও দুঃখী সাহায্যপ্রার্থীর জন্য ঝামাপুকুর রাজবাটীর দ্বার অবিরত উন্মুক্ত। কোন উপযুক্ত প্রার্থীই রাজবাটী হইতে বিফলমনোরথ হইয়া ফেরৎ আসে না; তাহারা আশার অতিরিক্ত সাহায্যপ্রাপ্ত হইয়া জোড়হস্তে দাতার দীর্ঘ-জীবন ও পরলোকগত রাজাবাহাতুরের অমরাত্মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়া চলিয়া যায়। তাই কবি মধুসুদন দত্ত গাহিয়াছেন,—

"সেই ধন্য নরকুলে
লোকে যারে নাহি ভোলে,
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্ব্বজন।"

কুমার নরেন্দ্রনাথের বিদ্যাশিক্ষা ও কর্ম্মজীবন

জীবে সেবা ও দাতব্য ভোজনাগার

রাজার কনিষ্ঠ পৌত্র কুমার নরেন্দ্রনাথ মিত্র শিক্ষালাভের জন্য প্রথমে হিন্দুস্কুলে ভর্ত্তি হন। পরে তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কুমার মন্মথনাথের ন্যায় ইউরোপীয় গৃহশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ইংরাজী ভাষায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। ১৮৩২ সালে তিনি সাবালকত্ব প্রাপ্ত হইয়া জমিদারী ষ্টেটের কার্য্য-নির্ব্বাহের জন্য অগ্রজ মন্মথনাথের সঙ্গে যোগদান করেন। দীনদুঃখীকে যথাসম্ভব সাহায্য দানার্থে তিনি সর্ব্বদাই মুক্তহস্ত। শিক্ষালাভের জন্য কঠোর পরিশ্রমী যুবকগণকে তিনি বহুপ্রকারে সাহায্য করিয়াছেন এবং এখনও করিতে-ছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ডাঃ এনি বেশান্ত কলি-কাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য যে আন্দোলন উপস্থিত করেন, তাহাতে কুমার নরেন্দ্রনাথ দরিদ্র ছাত্রদেব জন্যই বিশেষ কার্য্যকরী অংশ গ্রহণ করিয়া জনসাধারণের ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

জীবে সেবাই মানবের ধর্ম্ম এবং সেই ধর্ম্মপালনের জন্য কুমার নরেন্দ্রনাথ তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতার সঙ্গে সংযুক্তভাবে সে সকল দানধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, আমরা পূর্ব্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি। রাজা দিগম্বর মিত্রের জীবন-কাহিনীতে

আমরা ইতিপূর্ব্বে সাপ্তাহিক "ইংলিশম্যান" পত্রিকার সম্পাদকের মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে, তিনি প্রতিমাসে বিভিন্ন স্কুল ও কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আশীজন ছাত্রকে ভরণ-পোষণ করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে তাঁহার জমিদারীর তত্ত্বাবধায়ক অবসরপ্রাপ্ত সাবজজ বাবু মহেন্দ্রনাথ বসুর আমল হইতে কুমারদ্বয়ের সাবালকত্ব প্রাপ্তির পর তাঁহাদের দ্বারা জমিদারীকার্য্যের ভার গ্রহণ করা পর্য্যন্ত ছাত্রদিগকে বাৎসরিক অর্থ-সাহায্য ব্যতীতও রাজার পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত এই দাতব্য ভোজনাগার চলিয়া আসিতেছে। জ্যেষ্ঠ কুমার মন্মথনাথ শ্যামপুকুরে নবনির্ম্মিত সৌধভবনে চলিয়া যাওয়ার পরও উভয় ভ্রাতারই তত্ত্বাবধানে ও অর্থানুকুল্যে এই দাতব্য অনুষ্ঠান পরিচালিত হইত। কিন্তু সার আশুতোষ যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার ছিলেন, তখন একদিন কুমার মন্মথনাথের নিকট আসিয়া স্বর্গীয় রাজা বাহাদুরের পুণ্যস্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনপূর্ব্বক তাঁহার অনুষ্ঠিত দাতব্য ভোজনাগারের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের দরিদ্র ছাত্রদিগের জন্যও কয়েক সহস্র টাকা দান করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করেন। তখন কুমার মন্মথনাথ "বাঙ্গালার বাঘ" সার আশুতোষের মত মনস্বীর অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ধনভাণ্ডারের বহু সহস্র টাকা এককালীন দান করেন। সেই হইতে কনিষ্ঠ কুমার নরেন্দ্রনাথ একাই পিতৃপুরুষের অনুষ্ঠিত এই দাতব্য ভোজনা-

গার বহু অর্থব্যয়ে পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। বলা বাহুল্য যে, বাঁধাধরা কোন নিয়ম কানুন না থাকিলেও কুমার মন্মথনাথের শ্যামপুকুর বাড়ীতেও সতন্ত্রভাবে কতিপয় ছাত্র দুইবেলা আহার্য্য পাইয়া থাকে।

গত অর্দ্ধ শতাব্দীরও অধিককাল ধরিয়া বাঙ্গলার বিভিন্ন মফঃস্বল জিলা—এমন কি ভারতের নানাস্থান ও সিংহল দেশ হইতেও আগত কতশত নিরন্ন দরিদ্র ছাত্র এই দাতব্য ভোজনাগারের সাহায্যে দিনপাত করিয়া কলিকাতায় বিদ্যার্জ্জন করতঃ মনুষ্যপদ বাচ্য হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আবার এই সকল ছাত্রের এখন মধ্যে অধিকাংশই জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট্, উকীল, ডাক্তার, প্রফেসার, ব্যারিষ্টার ও ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি উচ্চ সম্ভ্রান্ত পদে থাকিয়া জীবিকার্জ্জন করিতেছেন। ঝামাপুকুর রাজবাটীরই পার্শ্ববর্ত্তী এক খ্যাতনামা ডাক্তার প্রথম বয়সে এই দাতব্য ভোজনাগারের সাহায্যে কলিকাতায় ছাত্র-জীবন সমাপ্ত করিয়া চিকিৎসা ব্যবসায়ে এখন বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন—কলিকাতায় স্থায়ী বসতির জন্য সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ ও ব্যাঙ্কে লক্ষাধিক অর্থও সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন। স্বর্গীয় রাজা বাহাদুরের পুত্রবধূ অর্থাৎ কুমার নরেন্দ্রনাথের ধর্ম্মশীলা বিধবা মাতাঠাকুরাণী যতদিন জীবিতা ছিলেন, ততদিন অপত্যস্নেহের বশবর্ত্তিনী হইয়াই দাতব্য ভোজনাগারে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া দরিদ্র ছাত্রদের আহারের সময় তত্ত্ব-তাল্লাস করিতেন। এখনও কুমার নরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার একমাত্র

সুযোগ্য বংশধর শ্রীযুত হিরণ্যকুমার মিত্র মহাশয়ও সময়ে সময়ে ভোজনাগারে উপস্থিত থাকিয়া আহারের সময় দরিদ্র ছাত্রদের খোঁজখবর লইয়া থাকেন। তাঁহাদের এই লৌকিকতাপূর্ণ আচরণ, জীবে সেবা ও পূর্ব্বপুরুষগণের আচরিত দয়া এবং পরোপকার ধর্ম্মের প্রতিই অপরিসীম অনুরাগজনিত হৃদয় ও মনের বিশালতারই সম্যক্ পরিচায়ক, সন্দেহ নাই। যেহেতু সাধক তুলসী দাস বলিতেছেন,—

তুলসী সন্তনকে সুনে সন্তত ইহৈ বিচার
তন্ ধন্ চঞ্চল জগ, অচল যুগ যুগ উপকার।

হে তুলসী, সাধুগণ সমীপে সতত এই বিচার শুনিতে পাওয়া যায় যে, দেহ ধন সকলই অস্থায়ী, জগতে কেবল পরোপকার ধর্ম্মই যুগ যুগান্তর স্থায়ী হইয়া থাকে।

দয়া ধরম্ কি মূল, নরক্ কি মূল অভিমান্।
তুলসী মৎ ছোড়িয়ে, যৎ কণ্ঠাগত জান্॥

ধর্ম্মের মূল দয়া এবং নরকের মূল অভিমান বা অহঙ্কার; অতএব হে তুলসীদাস, তুমি কণ্ঠাগতপ্রাণ হইলেও ধর্ম্মকে কদাচ পরিত্যাগ করিও না।

কুমার নরেন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতা

কুমার নরেন্দ্রনাথ ঈদৃশ শান্তস্বভাববিশিষ্ট যে তিনি কখনও ঐশ্বর্য্যের জাকজমক প্রদর্শন পছন্দ করেন না। তাঁহার স্বভাব সাধারণতঃ অধ্যাত্মভাবপ্রবণ বলিয়া তিনি বেশী নির্জ্জনতাপ্রিয়। এজন্য সাধারণের কার্য্যে তিনি একপ্রকার সংস্রবশূন্য হওয়ায় তাঁহার জীবন-কাহিনী তাঁহার পিতামহ রাজা দিগম্বর মিত্র ও জেষ্ঠভ্রাতা কুমার মন্মথনাথের জীবনের মত তত ঘটনাবহুল নহে। পরম বৈদান্তিক ৺শঙ্করাচার্য্যের মতে পদ্মপত্রস্থিত জলের ন্যায় মানবজীবন নিরতিশয় চঞ্চল ও ক্ষণভঙ্গুর জানিয়া, সংসারে নির্লিপ্তভাবে অনাসক্ত জীবনযাপন করতঃ ধর্ম্মচর্চ্চাই তাঁহার জীবনের প্রধান কাম্য ছিল। বোধহয়, শিশুকালে—যখন জাগতিক কোন জ্ঞানালোকই তাঁহার হৃদয়-কন্দরে প্রকাশিত হয় নাই—আকস্মিক দুর্ঘটনাতে সম্পূর্ণ সুস্থকায় পিতার শোচনীয় মৃত্যুদৃশ্য দর্শনে তাঁহার মনের ভাব উত্তরকালে এবম্বিধরূপে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। শাস্ত্রকারেরাও বলিতেছেন,—

নধর্ম্মকালঃ পুরুষস্যনিশ্চিতো
নচাপিমৃত্যুঃ পুরুষং প্রতীক্ষতে
যদাহি ধর্ম্মস্য ক্রিয়ৈব শোভনা
যদানরো মৃত্যুমুখেঽভিবর্ত্ততে ॥

মৃত্যু মনুষ্যের সময় অসময় বুঝিয়া প্রতীক্ষা করেনা; অতএব মনুষ্যের ধর্ম্মানুষ্ঠানের কোন নির্দ্দিষ্ট কাল নাই; জন্মের পর হইতেই মনুষ্য যখন মৃত্যুমুখবর্ত্মে প্রবেশ করিতেছে, তখন বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য, শুচি ও অশুচি—সকল সময়েই যথাযথ ধর্ম্মানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। আজকাল অনেক ভোগপ্রবৃত্তি পরায়ণ বিলাস-বিহ্বল ধনী ব্যক্তির মুখে প্রায় শোনা যায় যে 'আরও কিছু বয়স হোক, তখন ধর্ম্মকর্ম্মের সন্ধান নেবো।' কিন্তু এসকল হস্তিমূর্খ ধনিগণ নশ্বর জগতের অনিত্য ইন্দ্রিয়-সুখে বিভোর হইয়া কদাপি ভাবেনা যে,—

একএব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনোঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেন সমংনাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছন্তি ॥

যে শরীরের চিরকাল শুশ্রূষা করিলাম—যে শরীরের সম্বন্ধীয় বর্গের সহিত চিরদিন আত্মীয়তা করিলাম, যে সকল লৌকিক বস্তুতে চিরদিন ভুলিয়া থাকিলাম, সে সমুদায় শরীরপাতের সঙ্গে সঙ্গে এখানেই পড়িয়া থাকিবে; কেবল একমাত্র ধর্ম্মই সুহৃদবৎ কল্যাণকারী হইয়া পরলোকের সহগামী হইয়া থাকে। কুমার নরেন্দ্রনাথ এ শ্রেণীর ভোগবিলাসীদের অন্তর্গত না হইয়া পুরাকালের রাজর্ষি জনকাদি সংসারমার্গাবলম্বী ধনশালিগণের ন্যায় সংসারকর্ম্মে একপ্রকার অনাসক্ত হইয়া নিয়ত সাধুসঙ্গ ও ভগবৎ-প্রসঙ্গের আলোচনায় দিন কাটাইতে ভালবাসেন।

সাধুসঙ্গের মহিমা

বৃহন্নারদীয় পুরাণে সাধুসঙ্গ হইতে কিরূপে ভগবানে অনন্যা ভক্তি জন্মে, তাহা বর্ণিত হইয়াছে, যথা—

ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্ত সঙ্গেন পরিজায়তে।

* * * * *

রবিশ্চ রশ্মিজালেন দিবাহন্তি বহিস্তম।
সন্ত মুক্তিমরীচৌঘৈশ্চান্ত ধ্বান্তংহি সর্ব্বথা॥

ভগবানে ভক্তি ভগবদ্‌ভক্ত-সঙ্গ হইতে জন্মিয়া থাকে। সূর্য্য কিরণমালা দ্বারা বাহিরের অন্ধকার নাশ করেন, কিন্তু সাধুগণ তাঁহাদিগের সদুক্তিরূপ কিরণজালের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সংসার-কলুষ-বাসনাজনিত ভিতরের অন্ধকার নাশ করেন। ভক্ত প্রহ্লাদ কহিয়াছেন, যে পর্য্যন্ত অকিঞ্চন বিষয়াভিমানী সাধুদিগের পদধুলি দ্বারা অভিষিক্ত না হইবে, সেই পর্য্যন্ত কাহারও মতি সংসার-বাসনানাশের উপায় যে ভগবানের চরণ-পদ্ম তাহা স্পর্শ করিতে পারিবে না; এজন্য পরম যোগী শঙ্করাচার্য্যও, তাঁহার সংসারমোহনাশক সঙ্গীতে বলিয়াছেন,—

তত্ত্বং চিন্তয় সততং চিত্তে, পরিহর চিন্তাং নশ্বর বিত্তে।
ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেখা ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা॥

পরমাত্মা তত্ত্ব সদা করহ চিন্তন।
অনিত্য ধনের চিন্তা করহ বর্জ্জন।

একমাত্র সাধুসঙ্গ ক্ষণেকের তরে ॥
তাহাই পারের তরী সংসার সাগরে।

সাধুসঙ্গে দস্যু রত্নাকর বাল্মিকীমুনি হয়—দস্যু অজামিল বৈকুণ্ঠ লাভকরে—জগাই মাধাই মহাপাতকীর উদ্ধার হয়। সাধু-সঙ্গে দেবর্ষি নারদও নবজীবন লাভ করেন। আরও একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। ভক্ত হরিদাস যখন বেনাপোলের বনে সাধন করেন, তখন তাঁহার বৈরাগ্যধর্ম্ম নাশ করিবার জন্য জমীদার রামচন্দ্র খাঁন একটী বেশ্যা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বেশ্যা হরিদাসকে প্রলুব্ধ করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার কুটীর দ্বারে বসিয়া থাকে, আর তিনি ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিতে থাকেন। কুলটা নারীর আশা—নাম জপ শেষ হইলে আপনার রূপের ফাঁদে ফেলিয়া তাঁহার সাধনা পণ্ড করিবে। নামজপ করিতে করিতে হরিদাসের রাত্রি ভোর হইয়া গেল। দ্বিতীয দিন সায়ংকালে সেই কুলটা নারী পুনরায় হরিদাসের কুঠীতে উপস্থিত হইল এবং নানারূপ অঙ্গভঙ্গী দ্বারা ভক্তের চিত্তবিকারে প্রয়াসী হইল। হরিদাস যথারিতি নাম-জপ ও নাম-কীর্ত্তনে রত হইলেন। হরিদাসের দিব্য শক্তির ভিতর দিয়া এক অপার্থিব জ্যোতিঃ বহির্গত হইতেছে। কণ্ঠ হইতে মধুর হরিধ্বনি উত্থিত হইতেছে—বারাঙ্গনা বসিয়া বসিয়া সকলই দেখিল। দ্বিতীয় রাত্রিও নাম কীর্ত্তনে শেষ হইলে সুন্দরী বারাঙ্গনা তৃতীয় দিনে সন্ধ্যাসমাগমে বেনাপোলের নির্জ্জন কুঠীরে

গমন করিল। হরিদাস আপন হৃদয়ে হরিনাম জপ করিতেছেন—অশ্রুধারায় তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি গভীর হইয়া আসিল। বারবিলাসিনী ভাবিল, এ ত মানব নয়—রক্ত-মাংসের দেহ লইয়া যে মানব এরূপ জ্বলন্ত প্রলোভন উপেক্ষা করিয়া হরিপ্রেমে উন্মত্ত হইতে পারে—সে নরলোকের অতীত। ভক্তের অমৃতময় নাম-কীর্ত্তনের ধ্বনিতে যেন স্নিগ্ধ বারিধারার ন্যায় তাঁহার হৃদয়ে উদ্দাম প্রবৃত্তির অনলশিখা নির্ব্বাপিত করিয়া দিল—তাহার হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। রাত্রিশেষ হইতে না হইতেই বেশ্যা হরিদাসের চরণে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল—আমি পাপিয়সী, আমার পাপের সংখ্যা নাই; তুমি আমাকে কৃপা করিয়া নিস্তার কর। সেই শুভপ্রভাতে বেশ্যার জীবনে সাধুসঙ্গের মহিমা বিঘোষিত হইল।

সাধক তুলসীদাস ধার্ম্মিকের লক্ষণ বর্ণনা করিতে যাইয়া যথার্থই বলিয়াছেন, এই জগত সংসারে বস্তুতঃ সাধুসঙ্গ, নাম-কীর্ত্তন, সর্ব্বজীবে দয়া, দীনভাবালম্বন ও পরোপকার—এই পাঁচটি রত্নই সার। এই পাঁচটি গুণের মধ্যে কোনটিই কুমার নরেন্দ্রনাথের অপ্রতুল ছিলনা। নিয়ত এই সাধুসঙ্গ ও ভগবৎ-প্রসঙ্গ আলোচনার জন্য কুমার নরেন্দ্রনাথ বাঙ্গলা দেশের বহুদূরে হিমালয় পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী লছমন ঝোলায় গভীর নীরবতাপূর্ণ নির্জ্জনস্থানে উদ্যানবাটী নির্ম্মাণ এক করিয়াছেন।

লছমন ঝোলায় সাধুসঙ্গ

পূতসলিলা গঙ্গার কলকল্লোলে, পর্ব্বতগাত্রের স্থানে স্থানে নির্ঝরিনীর ঝরঝর নাদে, স্থানে স্থানে তপোবনসদৃশ আশ্রম-নিচয়ে বহু সাধুসন্ন্যাসী-অধ্যুষিত এই লছমন ঝোলার প্রাকৃতিক নয়নাভিরাম দৃশ্যের গাম্ভীর্য্যপূর্ণ শোভা দর্শন করিলে সংসার-তাপ-দগ্ধ মানবের মন স্বতঃই ভগবানের দিকে ধাবিত হয়। সম্মুখে নীল-সলিলা সরিদ্বরা গঙ্গার মনোরম সৌন্দর্য্য—পরপারে দূরে—বহুদূরে অমলধবল হিমানীমণ্ডিত শতশৃঙ্গসমন্বিত অনন্ত পর্ব্বতমালার পশ্চাতে তুষারাবৃত ধবলগিরির অনলঙ্কৃত স্থির গম্ভীর বিমল শান্ত-শোভা দেখিলে মনে হয়, সংসার-সংগ্রামনিরত ত্রিতাপতাপিত মানব ঐস্থানে গিয়া বসতি স্থাপন করিতে পারিলে সংসারের সকল জ্বালা হইতে মুক্ত হইতে পারে। কুমার কলিকাতা নগরীব নিয়ত কল-কোলাহল-মুখর রুদ্ধ-বাতাস হইতে এই নির্ম্মল, নিদ্বন্দ ও নির্জ্জন স্থানে ছুটিয়া আসিয়া বৎসরের অধিকাংশ সময় ভগবৎপ্রসঙ্গের আলোচনায় নিরত হইয়া থাকেন। এইজন্য প্রত্যহ তাঁহার বাসভবনে বহু সাধুসন্ন্যাসী ও যোগীপুরুষেরা আসিয়া থাকেন এবং তিনিও মধ্যেমধ্যে সাধু-সন্ন্যাসীদের আশ্রমে যাইয়া থাকেন। সাধুসঙ্গে ভাগবৎপ্রসঙ্গ আলোচনায় কখন কখন তাঁহার সমস্ত রাত্রিও অতিবাহিত হইয়া যায়। এ সম্বন্ধে কুমারের মৃত

পৌত্র প্রফুল্লকুমারের লিখিত "লছমন ঝোলার ভ্রমণ-কাহিনী" হইতে কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার জীবন-কথা শেষ করিতেছি ঃ—

হৃষিকেশের বাজার ছাড়িয়ে প্রায় এক মাইল দূরে "মৌনি কিরেতি" বলে একটা জায়গা আছে, সেইখান পর্য্যন্ত মোটর যায়, সেইখান থেকে ডাণ্ডি করে লছমণ ঝোলা যেতে হয়। আমাদের মোটর প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে মৌনি কিরেতিতে এসে পৌঁছলো, ত্ব' জায়গায় গাড়ী থামে, ছোট করে একখানি ঘব আছে, সেখানে টোল দিতে হয়, আমাদেরও দিতে হয়েছিল। আমরা মৌনি কিরেতিতে নেবে—আগে থাক্‌তে আমাদের ডাণ্ডি ঠিক করা ছিল, তাইতে চড়ে লছমণ ঝোলায় আমাদের বাড়ীর দিকে রওনা হলুম। সেখান থেকে আমাদের বাড়ী প্রায় তুই মাইল আড়াই মাইল হবে। পাহাড় কেটে রাস্তা, ত্ব'ধারে পাহাড় ও গাছ, নানান্ ধরণের পাখী দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমরা চল্লুম। সকাল আটটা, সাড়ে-আটটা নাগাত আমাদের বাড়ী পৌঁছুলুম। বাড়ীতে নেবে যে যার কাজ কর্ম্মে লেগে গেল, আমি ঘুরে ঘুরে চারদিকে দেখতে লাগলুম।

বাড়ীখানি ঠিক গঙ্গার উপর। সামনে পাহাড় তার কোলে গঙ্গা আর তার এপারে আমাদের বাড়ী। বাড়ীর বারান্দায় বসে গঙ্গা দেখ—বদ্রীনাথের যাত্রী সব নৌকা করে পার হচ্ছে, মুখে "বদ্রীবিশাল কি জয়" "গঙ্গা মায়ীকি জয়" বল্‌তে বল্‌তে যাচ্ছে, তাই দেখ। ওপারে ঠিক পাহাড়ের

কোল দিয়ে যাবার রাস্তা। আমরা সেখানে দু'মাস ছিলুম, অনেক জায়গায় বেড়াতে যেতুম—পরে বলব।

সেই রাস্তা দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে কতদূর চলে যেতুম। কি—আশ্চর্য্য। কল্‌কাতায় ত কখনও হেঁটে বেড়াইনি, এখানে এত বেড়ালে কষ্ট হবার কথা, কিন্তু মোটেই কষ্ট বোধ করতুম না।

পাহাড়ের সরু চড়াই নূতন নূতন যায়গায় যেতুম। একদিন গরুড়-চটী গেছ্‌লুম। কেমন সুন্দর নির্জ্জন যায়গা। একটী সুন্দর ঝরণা আছে—পাহাড় দিয়ে ঘেরা, ঠিক যেন একটী মানুষের হাতের তৈরী করা বাথ-রুম। বেড়াবার এমন উৎসাহ যে, সেই সরু রাস্তা ধরে একদিন ফুলচটী গেছ্‌লুম,—ফুলচটী গরুড়চটী থেকে দু'মাইল। সেখানের দৃশ্যটী ভারি চমৎকার। ছোট চটী, কিন্তু যায়গাটী ভারি সুন্দর। সেখানে একজন সাধু থাকেন, তিনিই চটী তদারক করেন, আমাকে কত আদর কল্লেন। তিনি একরকম সরবৎ তৈরী করে খেতে দিলেন, খেতে খুব চমৎকার, আমার অতখানি গিয়ে যে কষ্ট হচ্ছিল, তখনি কষ্ট চলে গেল। আমি আবার অতখানি পথ ফিরে এলুম, আমার কোনও কষ্ট হলো না।

লছমণ ঝোলার ওপারে "সত্য সেবাশ্রম" বলে একটি ছোট্ট ডাক্তারখানার মতন আছে। স্বামী কালিকানন্দ গিরি—তাঁরই আশ্রম, তাঁরই উৎসাহে তৈরী। সেখানকার যত পাহাড়ী গরীবদের অমনি চিকিৎসা হয়—সেখানে একজন

ডাক্তার বারোমাস থাকেন, বাঙ্গালী—তিনিও সাধু, তাঁর নাম "জ্ঞানানন্দ স্বামী।" তিনি আমাকে খুব ভালবাসতেন—রোজ গঙ্গা পার হয়ে আমাদের বাড়ী আস্‌তেন—আমি রোজ সকালে ওপারে গিয়ে তাঁরই সঙ্গে বেড়াতে যেতুম। তিনি আর আমি দু'জনে যেতুম, মধ্যে মধ্যে দাদামণিও আমাদের সঙ্গে যেতেন।

একদিন আমি অনেক করে দাদামণিকে নীলকণ্ঠ মহাদেব দেখ্‌তে যাবার জন্যে বল্‌তে, তিনি যাবার ঠিক করলেন। আমরা প্রায়ই সেই রাস্তায় যেতুম খানিকটা করে—"ভূতনাথ আশ্রম" বলে একটী সাধুর আশ্রম আছে, সেইখান পর্য্যন্ত। দু'ধারে সুন্দর সুন্দর দৃশ্য। ময়ূর, হরিণ সব পাহাড়ের উপর কেমন নির্ভয়ে বেড়াচ্ছে, দেখ্‌তুম; দেখে দেখে আমার খুব যাবার ইচ্ছা হতো। নীলকণ্ঠ মহাদেব যাবার রাস্তা হচ্ছে স্বর্গদ্বারের দিক দিয়ে, বদ্রীনারায়ণ যাবার দিক দিয়ে নয়। ওপারে গিয়ে দেখা যায় দু'টো রাস্তা আছে। একটী টিহিরীর মহারাজের, অপরটী কোম্পানীর রাস্তা, একটী ফটক করা আছে। নীলকণ্ঠ যাবারও দু'টো রাস্তা আছে, একটা পাক-দণ্ডি—সেটা বড় সরু, আর একটা একটু সোজা ও চওড়া ডাণ্ডী যাবার। আমাদের ডাণ্ডী করে যাবার ঠিক করা হলো অবশ্য সোজা রাস্তাটা দিয়ে।

আমাদের চারখানি ডাণ্ডী ঠিক করা হলো। সকাল সাড়ে-ছয়টার ভেতর বেরুন গেল,—আমরা নৌকায় ওপারে গেলুম। আমাদের ডাণ্ডীগুলি আমাদের আগেই পার হ'য়ে ওপারে

গিয়ে বসেছিল। আমরা তাইতে চড়লুম। আমি, দাত্নমণি, আমার মা ও দাত্ন-মা এই চারজন। চারখানা ডাণ্ডীই একসঙ্গে চল্‌তে লাগল। সে যে কি সুন্দর রাস্তার দৃশ্য—ত্ন'ধারে ছোট কুঁড়ে, এক-একটী সাধুর আশ্রম, তাঁরা সকলেই আশ্রমের সামনে একবার করে দাঁড়িয়ে "নমো নারায়ণায়ঃ" উচ্চারণ ক'রে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, "কোথায় যাওয়া হবে।" আমাদেরও কাজেই নেবে নেবে যেতে হচ্ছিলো, সকলেই রাস্তার কথা বলে দিতে লাগলেন। আমরা আগে শুনেছিলুম পাহাড়ের উপর হাতী বেরোয়, কাজেই তাঁদের জিজ্ঞাসা করতে সকলেই বল্‌তে লাগলেন,—হ্যাঁ বেরোয়, ও মাঝে মাঝে রাত্রে এ দিকেও আসে, তবে মানুষ সামনে না পড়লে কিছু বলে না।"

আমরা চল্লুম, ক্রমশঃ সাধুদের আশ্রমগুলি অদৃশ্য হয়ে গিয়ে পাহাড় আর গাছ দেখ্‌তে দেখ্‌তে যাচ্ছি—এমন সময় একটা মশ্ মশ্ শব্দ শোনা গেল,—হ্যাঁ, রাস্তার ত্ন'ধারে বাঁশবন খুব বেশী ও বেল্‌গাছ। এখন সেই শব্দ শুনে আমাদের সামনের ডাণ্ডীওলাগুলো একেবারে থেমে গেল। থেমে গিয়ে দেখে, প্রায় হাত-কুড়ি দূরে—বাঁশঝাড়ের ভেতর একটী হাতী তার বিরাট দেহ নিয়ে আপন মনে বাঁশ-ঝাড় চিবুচ্ছেন, তারই আওয়াজ হচ্ছে মশ্ মশ্।

এখন হয়েছে কি সামনের ডাণ্ডীওলাগুলো থামতেই, পেছুনের ডাণ্ডীওলাগুলো, একেবারে একসঙ্গে সকলে তাদের পাহাড়ী ভাষায় চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করে উঠ্‌লো "কি হয়েছে।"

স্বর্গীয় প্রফুল্লকুমার মিত্র

সেই গোল না শুনে—হস্তীমশায় একেবারে সামনে ফিরে দাঁড়ালেন,—যেন জিজ্ঞাসা করৃতে"হ্যাঁ হয়েছে কি"—ওরাও যখন চেঁচিয়ে উঠেছে, ময়ুরগুলোও গাছের ওপর থেকে ডেকে উঠেছে, তাইতে আরও শব্দটা বেশী হয়ে উঠেছিল। হাতীকে সামনে ফিরতে দেখে, ডাণ্ডীওলাগুলো—"হাতী হ্যায়" না বলে, ডাণ্ডীশুদ্ধ চোঁ-চাঁ দৌড়। একেবারে সব একদমে দৌড়ে যেখানে ভুতনাথ আশ্রম সেখানে এসে থামলো। থেমেই ডাণ্ডীগুলোকে রেখেই খুব হাঁপাতে লাগ্‌লো, আমরাও এক রকম ভ্যাবাচাকা খেয়ে, কি যে হলো ঠিক করতে পারৃলুম না। তবে আমরা হাতীটাকে স্পষ্ট দেখিনি তার আওয়াজ শুনে-ছিলুম, কেবল আমার মায়ের ডাণ্ডীখানি আগে ছিল, তিনিই হাতীটাকে স্পষ্ট দেখেছিলেন।

যা হ'ক্ আমাদের আর নীলকণ্ঠ মহাদেব যাওয়া হলো না। ভুত্তনাথ আশ্রমে বেড়িয়ে বাড়ী ফিরে আসা হলো।

এই রকম রোজ হেঁটে বেড়িয়ে গঙ্গার নৌকা করে বেড়িয়ে কোথা দিয়ে যে দিন কেটে যেত জানতে পারৃতুম না।

একদিন পাণ্ডব-কুয়া দেখতে গেছলুম। গঙ্গার মাঝে ছোট একটী পাহাড় তার মাঝখানে কুয়ার মনে আছে। প্রবাদ পাণ্ডবেরা এটা করে ছিলেন,—ভীম বোধ হয় করে ছিলেন। পাণ্ডব-কুয়ায় নৌকা করে যেতে হয়।"

* * * *

উপসংহার

সাধুসঙ্গ লাভের সুবিধার্থে কুমার নরেন্দ্রনাথ লছমন ঝোলায় এই বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কথিত আছে, কুমার নরেন্দ্র নাথ জীবনের প্রথমভাগে বিপুল ভোগ ও ঐশ্বর্য্যের মোহ পরিত্যাগ করিয়া প্রবজ্যা বা সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সাধুসঙ্গ লাভের জন্য গৃহত্যাগ করেন এবং ঐ সকল সাধু-মহাত্মার অন্বেষণে পদব্রজে হিমালয়ের দুর্গমপ্রদেশে গমন করেন ; কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কুমার মন্মথনাথ অনেক কষ্টে তাঁহাকে গৃহে ফিরাইয়া আনেন।

কুমার নরেন্দ্রনাথের একমাত্র পুত্র শ্রীযুত হিরণ্যকুমার মিত্র ও দুইকন্যা বিদ্যমান। শ্রীযুত হিরণ্যকুমারই এখন তাঁহার বিশাল জমিদারীকার্য্য সুচারুরূপে পর্য্যবেক্ষণপূর্ব্বক পরিচালনা করিতেছেন। তিনিও পিতৃপুরুষগণের পদাঙ্ক অনুসরণে দীন-দুঃখিগণের সহায়ক ও দরিদ্র সাহিত্যিক গণের পৃষ্ঠপোষক। তিনি সবিশেষ কর্ম্মদক্ষতাগুণে জমি-দারী-অঞ্চলে দেশীয় শিল্পকলা, ব্যবসায় ও আধুনিক উন্নত প্রণালীর শিক্ষা এবং চিকিৎসাদির প্রচলনে সহায়তা করিয়া দরিদ্র প্রজাগণের বহু উন্নতিসাধন করিয়াছেন। তিনি "সুন্দর বন জমিদার-সভার" সভাপতি ও ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়া-এসোসিয়েশনের সহ-সভাপতিরূপে এবং অন্যান্য বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া দেশেরও প্রভূত উপকার সাধন করিতেছেন।

স্বর্গীয় প্রফুল্লকুমার মিত্র

১৯১৬ সালের ২৪শে জানুয়ারী ঝামাপুকুর রাজবাটীর শুদ্ধান্তঃপুর আলোকিত করিয়া কুমার শ্রীযুত হিরণ্যকুমার মিত্র মহাশয়ের প্রথম পুত্র প্রফুল্লকুমার জন্ম পরিগ্রহ করেন। বর্ষাকালের মেঘভারাক্রান্ত আকাশে বিজলীচ্ছটার ন্যায় স্বর্গের দেব-শিশুর জন্মলাভে বহুদিনের নিরানন্দ, অন্ধকারাচ্ছন্ন রাজপুরী যেন হঠাৎ স্বর্গীয় আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ধার্ম্মিক কুমার নরেন্দ্রনাথ কত দীর্ঘ বৎসর ধরিয়া— কত দীর্ঘ বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করিয়া পৌত্রমুখ দর্শনের জন্য তাঁহার ইষ্টদেবতার পদে আকুল প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন, আজ তাঁহার সেই প্রার্থনা সফল হইয়াছে জানিয়া পরম পুলকিত হইলেন। শুদ্ধান্তঃপুরে পুরমহিলাগণের সুমধুর কোকিল-কণ্ঠনিন্দিত হুলুধ্বনি ও মুহুর্মুহু শুভশঙ্খনিনাদ—বহির্ব্বাটীতে ঢাক-ঢোল-সানাইয়ের প্রাণস্পর্শী আরাব ও সমাগত প্রার্থী এবং দর্শনার্থী স্বজনগণের আনন্দ-কোলাহলে সংমিশ্রিত হইয়া রাজবাটী মুখরিত করিয়া তুলিল।

আনন্দাতিশয্যে কুমার নরেন্দ্রনাথ, পৌত্রের জন্মলগ্নে সমাগত দীন-দুঃখী, অন্ধ-অনাথ-আতুর, দরিদ্র কর্ম্মচারী ও

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণকে তাঁহার মঙ্গল-কামনায় বহু স্বর্ণরৌপ্য ও নব বস্ত্রাদি দান করিলেন। তাহারাও নবজাত শিশুর মঙ্গল কামনায় ভগবদ্‌সমীপে প্রার্থনা করিতে করিতে চলিয়া গেল। জ্ঞাতি, বন্ধু, সুহৃৎ ও আত্মীয় রমণীগণ নানা উপহার দ্রব্য লইয়া নবজাত শিশুর মুখাবলোকনের জন্য শুদ্ধান্তঃপুরে আগমন করিতে লাগিলেন। গ্রীষ্মকালে সূর্য্যাতপে পরিতপ্ত জনগণ পূর্ণ-চন্দ্রের স্নিগ্ধালোকে যে প্রকার আহ্লাদিত হয়, তাঁহারাও এই শিশুর সুন্দর মুখকমল দর্শন করিয়া তদ্রূপ আনন্দিত হইলেন। সকলেরই অন্তঃকরণ প্রফুল্লিত করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া শুভদিনে নবজাত কুমারের নামকরণ হইল–'**প্রফুল্লকুমার**'। সুগোল, সুঠাম, নধরকান্তি শিশুর অপূর্ব্ব তেজপুঞ্জ-কলেবর—স্বর্গীয় আভাস্ফুরিত বদনকমলের শোভা দর্শন করিয়া মনে হইত—স্বর্গবাসী কোন পুণ্যাত্মা যেন জন্মান্তরীণ কর্ম্মক্ষয়ের জন্যই দ্যুলোক ত্যাগ করিয়া ভূলোকে জন্ম লইয়াছে।

শুক্লপক্ষীয় শশিকলার ন্যায় প্রিয়দর্শন শিশু আত্মীয়-পরিজনের আনন্দবর্দ্ধন করিয়া দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। প্রফুল্লকুমার যে সংসারে জন্মিল, তাহা পরম পবিত্র বৈষ্ণবের সংসার—সেখানে অহোরাত্র কেবল ধর্ম্মচর্চ্চা ও সৎকার্য্যসকল অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তাহার পিতামহ কুমার নরেন্দ্রনাথের ন্যায় তাহার ধর্ম্মশীলা পিতামহীও নিরন্তর ধর্ম্মচর্চ্চা ও নিষ্ঠাসহকারে শাস্ত্রানুমোদিত সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিয়া অবসরকালে গীতা,

ভাগবত, পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারতাদি শাস্ত্রগ্রন্থসকল পাঠ করিয়া সময় অতিবাহিত করিয়া থাকেন। পরিবারের লোকজন, দাস দাসীটী পর্য্যন্ত সকলেই সেই উচ্চ আদর্শে গঠিত, সুতরাং তেমন উচ্চবংশসম্ভূত রাজ-পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া— নিরন্তর উজ্জ্বল সৎদৃষ্টান্ত-সমূহের মধ্যে থাকিয়া শৈশব হইতেই তাহার মন-প্রাণ, প্রবৃত্তি ও দেহও সেই ভাবে গঠিত হইতে লাগিল। সাধারণ বালক যেরূপ হয়, প্রফুল্লকুমার যেন তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত হইল। সে গম্ভীরপ্রকৃতি ও ভাবুক হইল ; তাহার ভাবুক মন নশ্বর জগতের ঊর্দ্ধে—বহু ঊর্দ্ধে বায়ুস্তরে প্লবমান বিহঙ্গের মতই যেন ভগবানের কারণ-সলিল-সিক্ত-রাজ্যে সতত বিচরণশীল হইয়া উঠিল ; সে বিশ্বস্রষ্টার মহিম্নস্তবে সতত ধ্যান-বিভোর ; তাই সেই শৈশবেই সে অনাদি শিবলিঙ্গ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার পূজার্চ্চনা করিতে ভালবাসিত ; পূজা করিতে করিতে অনেক সময় ধ্যান-তন্ময়চিত্তে বাহ্য জগতের কল-কোলাহল বিস্মৃত হইয়া ক্ষুত্তৃষ্ণা পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাইত।

প্রফুল্লকুমারের জন্মগ্রহণের পরে হিরণকুমারের আরও দুই পুত্র ভূমিষ্ঠ হয় ; কিন্তু জন্মগ্রহণের কয়েক মাস পরেই তাহারা মৃত্যুমুখবর্ত্মে প্রবেশ করে। তাঁহার পুত্রত্রয়ের মধ্যে কেবল এই সুদর্শন বালকটীই এই নশ্বর পৃথিবীতে পিতামহ পিতামহী, মাতাপিতা ও অন্যান্য পুরবাসী আত্মীয়-স্বজনগণের

আনন্দবর্দ্ধন করিয়া কয়েক বৎসরমাত্র জীবিত ছিল। কিন্তু তখন কে জানিত যে, সেও তাঁহাদের সকলেরই হৃদয়ে দুর্নিবার শোকশেল বিদ্ধ করিয়া অকালে সেই মহাকাল শিবের—তাহারই আরাধ্য-দেবতার আহ্বানে মর্ত্ত্যলোকের মায়ামোহ, খেলাধূলাও পূজার্চ্চনা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে? ক্রমে বিদ্যাশিক্ষার উপযুক্ত বয়স হইলে সে হিন্দুস্কুলে প্রেরিত হয়। স্কুলেও সে সমপাঠী বালকগণের মন আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিল! ক্লাসে সে লেখাপড়ায়, স্বভাবচরিত্রে ভাল ছেলে ছিল বলিয়া শিক্ষকগণও তাহাকে যথেষ্ট আদর ও স্নেহ করিতেন। ইংরেজীতে একটী প্রবাদ আছে—"Morning shows the day". জীবনের সেই ঊষা-মুহূর্ত্তে বালক প্রফুল্লকুমারের মধ্যে যে সকল আদর্শ গুণের সমাবেশ দেখা গিয়াছিল—বাঁচিয়া থাকিলে সেও ভবিষ্যতে জীবনের সকল স্তরেই একজন আদর্শপুরুষ হইয়া দেশের, সমাজের ও পূণ্যশ্লোক রাজা দিগম্বর মিত্র বাহাদুরের বংশের মুখোজ্জ্বল করিতে পারিত সন্দেহ নাই! কিন্তু অর্দ্ধস্ফুট কুসুম পরিপূর্ণ সুবাস বিতরণ না করিয়াই বৃন্তচ্যুত হইয়া গেল—প্রবাদ প্রবাদই রহিয়া গেল।

যে কয়েক বৎসর প্রফুল্লকুমার এই মর-পৃথিবীতে ছিল, কোন্নগর মিত্রবংশের জনপ্রবাদমূলক বদান্যতা চর্চ্চার প্রবৃত্তি যেন সংক্রামক রোগের ন্যায়ই তাহাতে সংক্রামিত হইয়াছিল। স্কুলে পড়িতে গিয়া দরিদ্র ছাত্রদের কাতর অনুনয়ে

সে ভাল ভাল জামা কাপড়, দামী ফাউনটেন্ পেন ও লিখিবার খাতাগুলি দান করিয়া বাড়ী চলিয়া আসিত। তাহাদের বিশাল রাজভবনের পার্শ্ববর্ত্তী রাস্তা দিয়া যে সকল দীনদুঃখী, ও বিপন্ন ভিখারী, দর্শক ও পথিকমণ্ডলীর করুণা উদ্রেকের জন্য প্রাণমাতান স্বরে গান গাহিয়া বা আকুল আর্ত্তনাদের স্বরে ভিক্ষা প্রার্থনা করিয়া নিয়ত চলিয়া যাইত, সে তাহাদিগকে ডাকিয়া আনিয়া উদরপূর্ত্তি করিয়া খাওয়াইয়া দিত, ভাল ভাল কাপড় জামা ও অর্থ দিয়া বিদায় করিত। পাছে মাতা পিতার নিকট তিরস্কৃত হইতে হয়, এজন্য এই সকল কাজ সে ভয়ে ভয়েই করিত—মাতাপিতাকে সে এত ভয় ও ভক্তি করিত! কিন্তু তাহার বদান্য পিতা কুমার শ্রীযুক্ত হিরণ্যকুমার সন্ধান লইয়া—পুত্র উপযুক্ত পাত্রেই দান করিয়াছে জানিতে পারিয়া, তাহাকে কিছুই বলিতেন না। তাহার প্রত্যেকটি কথায় ও আচরণে বোধ হইত—সে যেন স্বর্গের শাপভ্রষ্ট দেবশিশু—মরণশীল মর্ত্ত্যের কেহই নহে।

অহো! রাজোদ্যানে যে ফুটিয়াছিল—সৌরভে প্রাণ মাতোয়ারা করিতেছিল—সে ফুল ঝড়িয়া গেল। শোকের বজ্রাঘাতে পিতা শ্রীযুত হিরণ্যকুমার ও তাঁহার পুণ্য-প্রাণা সহধর্ম্মিণীর অন্তঃস্থল দীর্ণ-বিদীর্ণ করিয়া সে চলিয়া গিয়াছে—রাখিয়া গিয়াছে তাঁহার অক্ষয়, অমর পুণ্যস্মৃতি ও সান্ত্বনার অর্ঘ্য— কবিতাগুচ্ছ ও গল্প-সম্ভার। স্বভাব-কবি ঈশ্বর গুপ্তের মত অল্পবয়সেই প্রফুল্লকুমারের মধ্যে কবি ও

সাহিত্যিকের প্রতিভা স্ফুরিত ও সঞ্জীবিত হইয়াছিল। গদ্যে পদ্যে,ইংরেজী ও বাঙ্গালায় সমান কৃতিত্বের সহিত ভক্তপূজারী-রূপে বাণীপূজার নৈবেদ্যসম্ভার রচনা করিতে সে সিদ্ধহস্ত ছিল! আমরা তাহার স্মৃতি উপলক্ষে এই অনবদ্য নৈবেদ্য সম্ভার লইয়া রচিত "**বাঙ্গালার নচিকেতা**" নামক এক খণ্ড পুস্তক উপহার পাইয়াছি। ইহাতে গ্রন্থকার তাহাকে উপনিষদের বাজশ্রবা ঋষির পুত্র নচিকেতার সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। কিন্তু নচিকেতার বহু ঊর্দ্ধেই তাহার আসন বলিতে হইবে। কেননা যজ্ঞস্থলে বালক নচিকেতার বারংবার উৎপাতে "উদাত্ত বেদমন্ত্র ধ্বনি স্তব্ধ করে" ক্রোধান্ধ ঋষি তাহাকে মৃত্যু অভিশাপ দেন—অষ্টম বর্ষীয় বালক নচিকেতা পিতাকে সত্যমুক্ত করিবার জন্যই সেই মৃত্যুকে কামনা করে। প্রফুল্লকুমারের রচিত "মৃত্যুকামী" কবিতা পাঠেই হয়ত লেখকের এই ধারণা জন্মিয়াছে; কিন্তু প্রফুল্লকুমারের সর্ব্বতোমুখী প্রশংসনীয় কার্য্যকলাপ চিন্তা করিলে এই তুলনাত সমীচীন নহেই—পরন্তু নচিকেতার বহু ঊর্দ্ধেই তাহার স্থান; কিন্তু ঐ পুস্তকে তাহার কবিতাবলী, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ও গল্পগুলির সমালোচনায় তাঁহার কবি-প্রতিভার প্রতি যথোচিত সম্মানই প্রদর্শন করা হইয়াছে।

এ সূত্রে একটি সত্যঘটনা মনে পড়িল। কোনও গ্রামে প্রাণকৃষ্ণ ও প্রাণহরি নামে প্রফুল্লকুমারেরই সমবয়সী দুই বালক বন্ধু ছিল। উভয়ে গ্রামের স্কুলে একই শ্রেণীতে পড়িত—উভয়ে হরিহর-আত্মা। প্রাণকৃষ্ণ গ্রামের জমিদারের পৌত্র

আর প্রাণহরি তাঁহাদের দরিদ্র প্রজার ছেলে। প্রতিবৎসর গ্রামের স্কুলে প্রত্যেক শ্রেণীতে বার্ষিক পরীক্ষায় যে যে ছেলে সর্ব্বপ্রথম হইত, জমিদার তাহাদিগের প্রত্যেকে তিন টাকা করিয়া মাসিক-বৃত্তি দিতেন। প্রাণহরি প্রতিবৎসর ঐ বৃত্তি পাইত। কিন্তু গৃহ-শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে প্রাণকৃষ্ণই এক বৎসর প্রথম হইয়া বৃত্তি পাইল। প্রাণহরি দ্বিতীয় হইল। ইহাতে তাঁহার দরিদ্র পিতা প্রায়শঃ তাহাকে প্রহার করিত। তখন বার্ষিক পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী। সে সময় প্রাণকৃষ্ণ একদিন বন্ধুর বাড়ীতে হঠাৎ বেড়াইতে আসিয়া তাহাকে পিতার নিকট বিষম প্রহার লাভ করিতে দেখিল। দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া সে দাদামহাশয়ের নিকট আব্দার ধরিল যে, পরীক্ষায় যে দ্বিতীয় হইবে, তাহাকেও যেন বৃত্তি দেন. কিন্তু কিছুই হইলনা, অথচ সে বন্ধু প্রাণহরিকে আশ্বাস দিয়াছিল যে, ইহার প্রতীকার সে করিবেই। পরীক্ষার আর দুই চার দিন বাকী অথচ পরীক্ষায় অনুপস্থিত থাকিবারও উপায় নাই। বন্ধুর কি করিয়া উপকার করিবে, ভাবিয়া ভাবিয়া সে আকুল হইল। একদিন সে জানিতে পারিল যে, 'মুন্সিদের এঁদো পুকুরে গুণে গণ্ডা আষ্টেক ডুব দিলেই জ্বর আসে।' এঁদো পুকুরের পঁচা ঠাণ্ডা জলে রাত্রে তাহার প্রবল জ্বর আসিল এবং জ্বরের ঘোরে 'জলপানী' 'জলপানী' প্রলাপ বকিতে বকিতে দুইদিন পরে মৃত্যুর পরপারে চলিয়া গেল। প্রাণহরি প্রথম হইয়া জলপানী পাইল। এই নিঃস্বার্থ পরোপকারী বালকটির সঙ্গেই প্রফুল্লকুমারের তুলনা হয়ত

মিলিতে পারে, কারণ প্রফুল্লকুমারও এই বালকটির মত নিঃস্বার্থ-পরোপকারী ছিল। তাহাদের রাজবাড়ীতে ছাত্রদের জন্য যে দাতব্য ভোজনাগার (free-boarding) আছে, তাহাতে প্রতিপালিত হইয়া স্কুলে পড়িবার জন্য যে সকল দরিদ্র ছেলে অনন্যোপায় হইয়া তাহাকেই ধরিয়া পড়িত, সে তাহাদের জন্য তাহার স্নেহশীল পিতা কুমার শ্রীযুত হিরণ্যকুমারের নিকট প্রাণান্ত চেষ্টা করিত। ক্লাসে প্রফুল্লও লেখাপড়ায় ঐ ছেলেটির মত অতি ভাল ছেলে ছিল। আবার ঐ ছেলে-টীর ন্যায়, এঁদোপুকুরের ঠাণ্ডা জলের মত লছমন্ ঝোলার বরফগলিত শীতল গঙ্গাজলে স্নানের পরই জ্বরাক্রান্ত হইয়া প্রফুল্লকুমার ভবধাম পরিত্যাগ করে!

গঙ্গাজলে মুক্তিস্নান করিয়া শাপ-মোচনান্তে শাপভ্রষ্ট স্বর্গের দেবশিশু আবার স্বর্গেই ফিরিয়া গিয়াছে। আজ আমরা তাহার পুণ্য ও পবিত্র স্মৃতি স্মরণ করিয়া "বাঙ্গালার নচিকেতা" হইতে তাহার অনবদ্য কবিতাগুচ্ছ চয়ন করিয়া তাহার অমর কবি-প্রতিভার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতেছি:—

———

প্রফুল্লকুমারের কবিতাবলী

—— ০: * :০ ——

পিসতুতো ভগ্নী অমলার নিকট পত্র

—— ০: * :০ ——

কল্যাণীয়া মেণ্টুরাণী—

ক্ষুদ্র তোমার পত্রখানি,
পৌঁছে গেছে আজকে ভোর
একেবারে বাঙ্গালোর।
ভাল আছি মোরা সবাই
তবে বাবার শরীর ভাল নাই
কেমন আছে দাদা-দিদি
জামাই বাবু, তুমি রাধি।
লিখ মোরে বিশদভাবে
কিছু না যেন বাদ যাবে
আজকে তবে আসি ভাই
ইতি তোমার নন্দ * ভাই।

---

* প্রফুল্লের ডাক নাম ছিল নন্দ

বিজয়ার দিনে

——*:•:*——

বোধনের করুণ সুরে
আজ কেন ভাই ঘুম ভাঙ্গেরে।
    সানাইয়ের করুণ-তানে
    বেদন জাগায় প্রাণে প্রাণে।
চলেছে রঙ্গীন সাজে
আজকে বিজয়া যে।
    হাসি আর কান্না-ভরা
    আজ প্রভাতে বসুন্ধরা,
বিজয়ার কাঁদন গাওয়া
বেদনার সিক্ত হাওয়া
    হেম-কণা তায় বুলিয়ে দেওয়া
    নিঝুম তরুর পাতায় পাতায়,
কমলের দলে দলে
বেদনা জাগায় টলে টলে।
ওরে ভাই আয়রে ছুটে
বেদনার অর্ঘ্য রচে পর্ণ-পুটে,
    নিয়ে আয় বরণ-ডালা
    কুসুমের পূর্ণ মালা,

মা যাবেন শম্ভু পাশে
কৈলাসের ওই শৈল-বাসে।
ওরে ভাই জোট করে আয়
চরণতলে অর্ঘ্য দিয়ে নিই বিদায়।

মুক্তিপথের যাত্রী

—:(*):—

কোন্ সুদূরের গানটী এসে
করল আমায় আনমনা,
বিষাদ-কাতর শিউরে তোলা
তোমার ও গান শুনবনা ॥
মুক্তিপথের যাত্রী আমি
অন্তহীনের ওই পথে।
চল্‌বো আজি দীপ্তি হ'য়ে
থাক্‌বেনা কেউ মোর সাথে ॥
জাগরণের সাড়া পেয়েও
ফিরবোনা আর আনন্দে,
অন্ত গিয়ে মুক্তি পেয়ে
পুজবো তাঁহার অর্ঘ্য দে।

ভাঙ্গাবীণা বাজবে না আর
উদাস করা ওই সুরেই,
মুক্তি-পথের যাত্রী বলে
বরবো আমি শান্তিকেই।
দখিন্ বায়ের করুণ-পরশ
লাগবে গায়ে, অন্তরে,
শিউরি উঠে মুক্তি-গান
বাজবে কোন সপ্তরে।
পাইনা গান পাইনা ভাষা
বোঝাতে ওই মুগ্ধদের,
নীরব ভাষায় বল্‌ছি ওরে
বিপথ থেকে ফের্‌রে ফের।
ও তো তাদের লক্ষ্যই নয়
লক্ষ্য তাদের মুক্তিরে,
মুক্তি-পথের পথিক হ'তে
চাই হৃদয়ের শক্তিরে।
বিধির বিধি কাটিয়ে তোলা
শক্ত সেরূপ রে
আমি মুক্তি-পথের পথিক বলেই
চাইবোনা ফিরে ॥

মৃত্যুকামী

—•:*:•—

আজ শেষের দিনে
স্নিগ্ধ মধুরিমা,
ছাপিয়া পড়ে মুগ্ধ ছায়ায়
মন আকাশের অনন্ত ওই
সীমায়
কি যেন সুখ
যেন বসন্তের মধুর হিল্লোল
আবেশ ভরে ছাপিয়ে তোলে বুক।
আমি মৃত্যুকামী!
নিত্য কালের ঘাত-প্রতিঘাতে
ভগ্ন হ'য়ে ডাক্‌ছি তোমায় স্বামী।
শেষের দিনে ঘনিয়ে যবে আস্‌বে—
কালো ছায়া,
লুটিয়ে পড়ব পায়।
প্রাণের টানে আস্‌বে ছুটে তোমার তরী
মনের কিনারায়।

নৃত্য দোদুল ছন্দেতে মোর
ভরিয়ে তোল বুক।
শান্তি-পথের পথিক কোরো,
না চাই সুখ দুঃখ!
তখন আলো ছায়ার অন্তরাল থেকে
থাকবো হাওয়ায় মিশে।
আমি মৃত্যুকামী।

অন্তহীনের যাত্রী

—— • :*: ——

শেষের দিনে মনে হয়
ওগো আজি মহাকাল রাত্রি
আমি অনন্তের যাত্রী—
মৃত্যুর সেথা নাহি পরিচয়—
পাপিয়া-কুজন বাতাস ভরায়—
অজানা পরশ শিহর লাগায়
অন্তহীনের যাত্রী!
আজি মহাকাল রাত্রি।

---

* মানকুমারী বসুর "ভিখারিণী মেয়ে'র ছায়াবলম্বনে।

সেথায় সবাই কিশোর; সবাই মুক্ত,
সবাই স্বাধীন, বিজয়-যুক্ত—
আমি বসে আছি জ্ঞান লুপ্ত
অন্তহীনের যাত্রী—
আজি মহাকাল রাত্রি।
সেথা নাই ভেদাভেদ, নাই অজানা
কলহ সেথায় দেয়না হানা
মনে বাজে বুঝি সুর সাহানা;
অন্তহীনের যাত্রী—
আজি মহাকাল রাত্রি!

On demise of late Mr. C. R. Dass

(1)

Caring not for fame and glory,
Glorious son of fair Bengal,
Nobly hast thou served thy Country,
Hastening at the duties call.

(2)

Never shall your glory perish,
Though in mortal eye you fall,
Strong your memory, all will cherish,
Glorious son of fair Bengal.

(3)

Revered son of fair Bengal,
You are in this world no more,
Yet thy Sacred mem'ry I' dore,
Keep fresh in my heart for all.

*   *   *   *

মৃত্যুকালে প্রফুল্লকুমারের মাত্র ত্রয়োদশ বৎসর বয়স হইয়াছিল এবং সে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়িত। 'চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র—তার ইংরাজী ভাষার—উপর ছন্দের উপর দেখিলে মনে হয় না কি সে ক্ষণজন্মা ছিল? এ রকম মেধাবী ও প্রতিভাবান্ ছেলে পৃথিবীর সকল দেশেই অতি বিরল।'

———

প্রফুল্লকুমারের গল্পাবলী

—— •:*:• ——

মিনু

তখন বেলা প্রায় পড়িয়া আসিয়াছিল।

কলিকাতার কোন এক গলিতে একটি ছোট বাড়ী হইতে পরেশবাবুর স্ত্রীর তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর শোনা যাইতেছিল।

তিনি বলিতেছিলেন. "হ্যাঁরে মিনু, বেলা যে যায়, উঠে ঘর সাফ্ করে রান্নাবান্না করবি কখন?

"আজ আবার উনি আফিস্ থেকে এলে থিয়েটারে যাবার কথা আছে। আস্তে ন'টা হবে। সমস্ত কাজ সেরে, রান্না-বান্না করে, খোকাকে দুধ খাইয়ে—ঘুম পাড়িয়ে রাখ্‌বি। যেন কিছু গোল হয় না—হ'লে মেরে পিঠের ছাল তুলে দেব।

ওঠ্ পোড়ার-মুখী—ওঠ তিন পো'র বেলা অবধি পড়ে পড়ে ঘুমুবে—বুড়ো-ধাড়ি মেয়ে!"

বলিতে বলিতে তিনি নিজে কাপড়-চোপড় পরতে ঘরে গেলেন। মিনু বেচারা চোখ মুছতে-মুছতে উঠে গেল।

পরেশবাবু একজন সামান্য গৃহস্থ। তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর নাম বিমলা—তিনি বড় ভাল লোক ন'ন। তাঁর এক-মাত্র সন্তান—আদরের অমল ওরফে অমুকে ছাড়া আর কাউকে

তিনি ভালবাস্‌তেন না। মিনুর ত কথাই নেই—একে সতীনে মেয়ে—তার উপর মা-হারা—প্রতিবাদ কর্‌বার কেউ নেই।

পরেশবাবু প্রথম প্রথম কিছু বল্‌তেন। শেষে হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন—বিমলার অখণ্ড প্রতাপের কাছে। কাজেই মিনুকে নির্ব্বিবাদে সকল অত্যাচার মুখ বুঁজে সহ্য কর্‌তে হ'ত। উপরন্তু হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর উপর দু'বেলা পেটভরা ভাতও জুট্‌ত না। বেচারী নির্জ্জনে ব'সে কাঁদ্‌ত আর স্বর্গগতা মায়ের কাছে নালিশ জানাত।

গৃহিণী সাজিয়া-গুজিয়া অমুকে মিনুর হাতে দিলেন। অমুর বয়স মোটে এক বৎসর, কাজেই সে থিয়েটারে যাবেনা। তিনি খোকার সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ মিনুকে সতর্ক করে স্বামীর সঙ্গে গাড়ীতে উঠলেন।

মিনু অমুকে কোলে নিয়ে ছল্‌ ছল্‌ চোখে দুয়ারে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর খোকাকে দুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে কাজ কর্‌তে উঠে গেল। কাজ সারিয়া রান্না-বান্না করিয়া খোকাকে আবার দুধ খাওয়াল। তারপর খোকাকে ঘুম পাড়াবার জন্য তাকে নিয়ে জানালার ধারে বস্‌ল। খোকা হাত-পা নাড়িয়া খেলা করিতে লাগিল। মিনু তার আগেকার কথা ভাব্‌তে লাগল। তার মৃতা মা'র কথা—অতীতে হারিয়ে যাওয়া আদরের কথা—তার মনে পড়্‌ল।

তার মা সবে ত দু'ছর গেছেন—ভাবতে গিয়ে তার

দু'চোখে জল এলো। তারপর খোকাকে কোলে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

এদিকে পরেশবাবু তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ী ফির্‌লেন—বাড়ীর সাম্‌নে এসে যা দেখ্‌লেন, তা'তে তাঁরা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

তাঁদের সেই ছোট বাড়ীতে আগুন ধরেছে। বাড়ীটা পুড়ে গেছে। বিমলা পাগলের মত কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন—তাঁর প্রাণের অমুকে বোধহয় আর পাবেন না। সে বোধহয় চির-জীবনের মত তাঁকে ছেড়ে চলে গেছে।

তিনি সেই পোড়া বাড়ীটা তন্ন তন্ন করে খুজ্‌তে লাগ্‌লেন। একটা ঘর অল্প পুড়েছিল, সেখানে অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন—তারপর আনন্দে চীৎকার করে উঠ্‌লেন।

তিনি দেখ্‌লেন—ঘরের একটা কোণে মিনু অমুকে জড়িয়ে ধরে পড়ে আছে—তার সর্ব্বাঙ্গ ঝল্‌সে পুড়ে গেছে। আর অমু তার বুকের ভিতর শুয়ে আঙ্গুল চুষ্‌ছে। সেও একটু ঝল্‌সে গেছে। তিনি তাকে কোলে তুলে বুকে জড়িয়ে ধর্‌লেন।

আর মিনু—তখন সে তার মার কাছে চলে গেছ্‌ল—তার মুখের মৃদু হাসি তখনও মিলিয়ে যায়নি।

বন্ধুর দান

—•:*:—

(১)

অস্তমিত তপনের লোহিতাভ কিরণ-জালে জগত এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল।

কতকগুলি বালক মাঠ হইতে খেলিয়া ফিরিতেছিল। তাহাদের মধ্যে দুইজনে খুব তর্ক হইতেছিল। কথা ক্রমে বাড়িয়া উঠিল।

গৌরবর্ণ বালকটি আর রাগ সাম্‌লাইতে না পারিয়া অপরকে মারিল। সকলে ছিঃ ছিঃ করিয়া উঠিল। অপর বালকটি কিছুই বলিল না। অন্যের অলক্ষ্যে জামার আস্তিনে চোখ মুছিল।

এক্ষণে ইহাদের পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

ফর্সা ছেলেটির নাম—অমিয়কুমার বসু, অন্য ছেলেটির নাম দিলীপকুমার ঘোষ, উভয়েই এক পাঠশালায় পড়ে। খেলায় ও পড়ায় দু'জনাই সমকক্ষ। খেলায় তাহাদের সহিত

কেহ পারিতনা। যাহা হোক্ ঝগড়া মিটিয়া গেল। কিন্তু কথা বন্ধ রহিল। তাহার পর হইতে তাহাদিগকে কেহ পরস্পরের সহিত কথা কহিতে দেখে নাই।

অমিয় কিন্তু দিলীপকে নানারূপে উৎপীড়ন করিত। সে কিছুই বলিত না। ইহাতে সকলেই অমিয়ের উপর বিরক্ত হইত।

একদিন দিঘীর পাড়ে খেলিতে খেলিতে অমিয় এম্‌নি ধাক্কা মারিল যে, দিলীপ গড়াইয়া জলে পড়িল। অনেক কষ্টে তাহাকে উদ্ধার করা হইল। সে কিন্তু একটুও উচ্চ-বাচ্যও করিল না।

(২)

তাহার পর আজ সুদীর্ঘ দশ বৎসর অতীত হইয়াছে। কালের কত চিহ্নই মর-জগত হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন বাঙ্গলাদেশের অবস্থা ভয়ানক। চোর-ডাকাতের রাম-রাজত্ব চলিতেছিল। কলিকাতা সহরে পুলিশ নাগরিকগণের উপর অমানুষিক অত্যাচার বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। সকলেই ভয়ে ত্রস্ত, সহজে কেহ সন্ধ্যার পর পথে বাহির হইতে চাহে না। জন-বহুল কলিকাতা তখন নির্জ্জন।

এম্‌নি যখন অবস্থা. তখন একদিন, রাত্রিকালে এক বৃহৎ প্রাসাদোপম অট্টালিকায় দুইটি লোক কতকগুলি অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া পরীক্ষায় ব্যস্ত ছিল। কক্ষটি নির্জ্জন। ইহা ভূগর্ভে অবস্থিত। বলা বাহুল্য—ইহা একটি তৎকালীন ডাকাতের আড্ডা। বিধাতার কি অপূর্ব্ব মহিমা!

আমাদের পূর্ব্বকথিত লোক দু'টির নাম—অমিয় ও দিলীপ। তাহাদের আবার মিলন হইয়াছিল, তবে ছদ্মবেশে অর্থাৎ দিলীপ তড়িৎ নাম ধারণ করিয়া তাহার কাছে চাকৃরি লইয়াছিল। এবং অল্পদিনে এতই বিশ্বাসী হইয়াছিল যে, অমিয় তাহাকে তাহার এ্যাসিস্‌টাণ্ট করিয়া লইল। এমন কি ভূগর্ভস্থ ঘরের চাবিটি পর্য্যন্ত তাহার নিকট থাকিত। ঐ চাবি ছাড়া নীচে যাইবার উপায় ছিল না! কিম্বা সুড়ঙ্গ দিয়া বাহিরে যাবার অন্য পথ ছিল না।

ভূগর্ভস্থ গৃহটী এতই সুরক্ষিত ও গুপ্তভাবে অবস্থিত যে পুলিশ সহস্র চেষ্টাতেও কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।

একদিন প্রভাতে যখন তরুণ-অরুণ তাহার হেমাভ মহিমা বিকীর্ণ করিতেছিলেন, তখন সেই পাষাণময়ী অট্টালিকার চতুঃপার্শ্বস্থ অধিবাসিগণ, নিদ্রাভঙ্গে, ভয়াবহ দৃশ্য অবলোকন করিলেন।

সেই অট্টালিকার চতুর্দ্দিকে ইংরাজ-সৈন্য—আদেশের প্রতীক্ষায় বন্দুক-হস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তাহাদের

তেজোদীপ্ত ভাব নাগরিকাগণের মনে ভীতির সঞ্চার করিতে ছিল। তাহাদের সুতীক্ষ্ণ বেওনেট ও ধাতুময় সাজ সূর্য্য কিরণে প্রতিফলিত হইয়া ঝল্‌ঝল্‌ করিতেছিল। সেনানায়ক সেই পাষাণ-পুরীর লৌহ-দ্বার ভাঙ্গিতে আদেশ দিলেন। সৈন্যগণ ভৈরব-হুঙ্কারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল।

এদিকে দ্বিতলের এক নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া অমিয়-কুমার কাহার প্রতীক্ষায় দ্বারের দিকে পুনঃ পুনঃ চাহিতেছিল। তাহার মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিয়াছিল ; ভুগর্ভের চাবী তাহার কাছে তখন ছিল না, থাকিলে কখনই ভাবনা থাকিত না। চাবী তখন তড়িতের কাছে—সে কোন কার্য্যে বাহিরে গিয়াছিল।

অমিয় জানিত যে পুলিশ তাহাকে ধরিতে পারিলে নিশ্চয়ই ফাঁসি দিবে! বাহিরে ভীষণ শব্দ হইতেছিল, দরজা ক্রমেই ভাঙ্গিয়া আসিতেছিল.। সৈন্যগণের চীৎকার ও উল্লাসে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইতেছিল।

হঠাৎ একটি দীর্ঘদেহ বলিষ্ঠ যুবককে অট্টালিকার দিকে দৌড়াইতে এবং পরক্ষণেই কি একটা দ্বিতলের জানলা লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িতে দেখা গেল! সঙ্গে-সঙ্গেই সুদক্ষ সৈনিকের অব্যর্থ গুলিতে তাহার রক্তাক্ত দেহ ভুতলে লুণ্ঠিত হইল—সে ইহ-জীবনের মত বিদায় গ্রহণ করিল। এই সেই তড়িৎকুমার।

এদিকে অমিয় কিছু ভাবিয়া ঠিক করিতে না পারিয়া হতাশায় চক্ষু মুছিল। বিশ্বের রূপ, রস, গন্ধ সবই মুছিয়া গেল!

কিন্তু—ওকি! বন্দুকের শব্দ কেন? সঙ্গে-সঙ্গে জানালার কাঁচ ভাঙ্গিয়া কি একটা গড়াইয়া তাহার কাছে আসিল।

অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত তুলিয়া লইয়া দেখিল—একটি পাথর-জড়ান রুমাল! রুমালখানি তড়িতের। তাহার মধ্যে ভূগর্ভ-বাহিরে যাইবার যে পথ—তাহারই চাবী।

রুমালখানির একটি কোণে লেখা—"দিলীপ"।

অভাগা বা ক্রোধের পরিণাম

——০: * :০——

পরেশবাবুর দুই ছেলে। বড়টির নাম 'অমল' ছোটটির নাম 'অজয়'। অমলের মত ভাল ছেলে সে-পাড়ায় আর কেউ ছিল না। সবাই তাকে ভালবাসে—তার বাবার ত' কথাই নেই।

কিন্তু হ'লে কি হ'বে? অমল ছিল—পরেশবাবুর কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে—আর অজয় ছিল তাঁর নিজের ছেলে। পরেশ বাবু কিন্তু দুজনকেই সমান ভালবাস্‌তেন। অজয়ের মা বিমলা দেবীর তা মোটেই সইত না।

বিমলা ভাব্‌তেন কি ক'রে অমলকে জব্দ করা যায়—স্বামীর মনটা কি করে তার বিরুদ্ধে বিগড়ে দেওয়া যায়।

* * * * * *
* * *

একদিন আফিস ফেরত বাড়িতে ঢুকেই পরেশবাবু ত্রস্তকণ্ঠে ডাক্‌লেন—"অমু—অমু"। উত্তর এলো—"যা—ই—ঈ"।

একটুবাদে অমু—ওরফে অমল, পরেশবাবুর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা কল্লে—"আমায় ডাক্‌ছিলে বাবা?" পরেশবাবু ধপ ক'রে বসে পড়ে বল্লেন—"হ্যাঁ, বাবা অমু—তুমি কি আমার লাল রংয়ের বই বা খাতা নিয়েছ?"

অমল বল্লে—"কৈ নিইনি ত'"—এমন সময়ে পরেশবাবুর স্ত্রী 'বিমলা দেবী' জল-খাবার নিয়ে ঘরে ঢুক্‌লেন। একটু যেন

বিস্মিত হ'য়ে বল্লেন—"একি ! এখনও জামা-কাপড় ছাড়নি ? যে ? ব্যাপার কি ?"

পরেশবাবু একটু হতাশ হ'য়ে বল্লেন—"বিমলা—সর্ব্বনাশ হয়েছে—আমায় বুঝি এখন জেলে যেতে হয়।" বিমলা দেবী বলে উঠলেন—"সে কি ! কেন, কি হয়েছে ?" পরেশবাবু বল্লেন—"কাল ভুল করে চেক্ বইখানা আফিস থেকে খাতাপত্তরের সঙ্গে নিয়ে এসেছিলুম—আজ আবার ভুল ক'রে নিয়ে যাইনি।" কিন্তু বিমলা, এখন এসে দেখছি যেখানে রেখেছিলাম, সেখানে নেই। এখন উপায় কি হবে ?"

—বিমলা দেবী একটা বিস্ময়-সুচক দৃষ্টি হেনে বল্লেন—"বল কি গো—অমলকে যে আমি দেখেছিলুম একটা লাল বই নিয়ে নাড়া-চাড়া কচ্ছিল, কেন সে ও-বইটা তোমায় দেয়নি।"

এই কথা শুনে পরেশবাবু অসম্ভব রেগে ভাব্‌লেন—কি অমল আমার কাছে মিথ্যা বলে—এত তার দুঃসাহস ! তাকে ত' সেভাবে গঠিত করিনি।

তাঁর তখন দশ বা এগার বছর আগেকার কথা মনে হ'লো। সেকথা প্রায় একরকম মন হ'তে লুপ্ত হয়ে গেছে। যখন তাঁদের গ্রামে বেড়াতে গিয়ে এক দেবশিশু কুড়িয়ে পেয়েছিলেন, তখন উভয়েরই কি আনন্দ, কি আহ্লাদ ! তখন সেই দেবশিশুর সুন্দর মুখে কালিমার রেখাপাত তিনি দেখেন্‌নি। অমলকে তিনি নিজের ছেলে বলেই ভাব্‌তেন।

আর আজ অমল—সেই দশ এগার বছর আগেকার দেব-শিশু, কি ক'রে এমন মিথ্যাবাদী হ'লো ! রোস্ আজ আমি

তাকে ভালভাবে শিক্ষা দেব! রাগে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে জিজ্ঞাসা কল্লেন—"অমল তোমার মা যা বল্‌ছেন—তা' সত্যি?

বিমলার কথা শুনে আর পরেশবাবুর রাগ দেখে, অমল গেছ্‌ল একেবারে—ভড়্‌কে—তবুও তার বিস্ময়ভরা জল-ভারাক্রান্ত চোখ দু'টী মা'র মুখপানে রেখে বল্লে—"না মা আমি ত নেইনি"। পরে পরেশবাবুর দিকে চেয়ে বল্লে—"না বাবা—সত্যি আমি নেইনি।" পরেশবাবু তখন রাগে জ্ঞান হারিয়েছিলেন। অমলের কথা শেষ হ'তে তার গালে এক প্রকাণ্ড চড় বসিয়ে দিলেন। অমল গেল মাটিতে পড়ে।

আসল ব্যাপারটি হয়েছিল এই—বিমলা দেবী ঘর গুছাতে এসে ঐ চেক্ বইটা দেখে, পরেশবাবুর কোটের আণ্ডার পকেটে রেখে দিয়েছিলেন। পরেশবাবু সে জামা প'রে সেদিন আফিসে যান। কাজেই সেই খাতাটি পকেটেই ছিল, কিন্তু অমলকে মার খাওয়াবার জন্যে বিমলা একটু মিথ্যে ক'রে পরেশবাবু কাছে লাগিয়ে দিলেন।

অমলের মা'র খাবার পর দু'ঘণ্টা কেটে গেছে—এখনও তার জ্ঞান হয়নি। ডাক্তার ডাকা হয়েছে। ডাক্তারের অনেক চেষ্টায়—তার জ্ঞান সঞ্চার একটু হলো। কিন্তু "বাবা আমি নিইনি" বলেই, সে আবার চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল এবং পরক্ষণেই আবার অজ্ঞান হ'য়ে গেল।

সবাই মিলে আবার তাকে শুশ্রূষা কর্ত্তে লাগ্‌ল এবং অনেকক্ষণবাদে সে জ্ঞান ফিরে পেল।

ডাক্তার তাকে ঘুমাতে বলে চলে যাচ্ছিলেন; তখন অমলের বাবা ভিজিটের টাকা দেবার জন্যে তাঁর সেই কোটের পকেটে হাত দিতে—হাতে একটা বাঁধান বই ঠেক্‌ল—তক্ষুণি সব ব্যাপার বুঝ্‌তে পার্‌লেন।

ডাক্তারকে ভিজিট দিয়ে বিদায় দিলেন। বিমলাকে কিছুই বল্লেন না।

তার পরদিন অমলের জ্বর হলো। সেই জ্বর ক্রমশঃ বিকারে দাঁড়াল। ডাক্তার এসে ওষুধ দিলেন, অনেক চেষ্টা কল্লেন—কিন্তু কিছুতেই অমল ভাল হলো না। অমল প্রলাপ বক্‌তে সুরু কর্ল্লে—"বাবা আমি নিইনি—আমায় মেরো না।"

"মা আমি নিইনি"—বল্‌তে বল্‌তে অস্তগামী সূর্য্যের সাথে অমলেরও শেষ নিশ্বাস বাতাসের সাথে মিলিয়ে গেল।

বিমলাদেবী তখন আর ঠিক্ থাকৃতে পার্‌লেন না। তিনি আর্ত্তরবে কেঁদে উঠ্‌লেন।

পরেশবাবু নির্ব্বাক্—নিস্পন্দ!

তারপর হ'তে আর পরেশবাবুর মত স্ফুর্ত্তিবাজ লোক্‌কে কেউ হাঁস্‌তে দেখেনি। তাঁর সর্ব্বদা অমলের শেষ কথা মনে হতো—"বাবা আমি নিইনে—সত্যি বল্‌ছি—আমায় মেরোনা"—

একদিন একটুখানি রাগের প্রায়শ্চিত্ত তাঁকে সারাজীবন ধরে কত্তে হয়েছিল।

উপসংহার

——:(*):——

প্রফুল্ল যে শুধু যে কবি, গল্প ও ভ্রমণ-কাহিনী-লেখক ছিল, তাহা নহে; সে একজন উচ্চদরের নিপুণ শিল্পীও ছিল। তাহার কম-করাঙ্কিত প্রাকৃতিক দৃশ্যশোভা-মণ্ডিত বহু চিত্র ও "বাঙ্গলার নচিকেতা"য় প্রকাশিত হইয়াছে।

বেতারে গীত হইবার জন্য "প্রফুল্ল-স্মৃতি" প্রতিযোগিতায়যে সকল গীত রচিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে কুমারী আশালতা বসু নাম্নী একটী অল্পবয়স্কা বালিকার রচিত নিম্নোক্ত গানটিই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী করুণ ভাবোদ্দীপক ও মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল। কুমারী আশালতা নিজেই সুমধুর স্বরে ও কালাংড়া সুরে বেতারে সেই গানটি গাহিয়াছিল;—

মরমে মরমে বেঁধেছিনু তোমা
দেখিনে যদিও নয়নে
সে কোন প্রলয় লয়ে গেল টেনে
রহিলে শুধুই স্মরণে
এস এস ভাই বুকে করে রাখি
আধ আলো আধ আঁধারে নিরখি
আমরা তোমারে রাখিব বাঁচায়ে
অমর করিব মরণে
দেখিনে যদিও নয়নে

বড় আদরের ভাই তুমি মম
ছিল প্রফুল্ল-ফুল-দল-সম
দয়াল নয় যে, ভয়াল ঠাকুর
হরে নিল হৃদি-রতনে
দলিয়া জনক জননী-হৃদয়
চলিয়া গেলে কেমনে

কুমার শ্রীযুত হিরণ্যকুমার এরূপ পর পর তিনটী পুত্রের মৃত্যুশোক প্রাপ্ত হইয়াছেন; তাঁহার দুর্নিবার শোকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা নাই। প্রফুল্লের অভাবে সুবৃহৎ ঝামাপুকুর রাজবাটী যেন অন্ধকারময় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। হিরণ্য কুমার অবিরত বদান্যতাধর্ম্মের চর্চ্চা ও পুর্ব্বপুরুষের অনুষ্ঠিত দাতব্য ভোজনাগারে বহু নিরন্ন ছাত্রকে প্রতিপালন করিয়া যে দরিদ্রনারায়ণের সেবা করিতেছেন, সেই ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পতরু শ্রীহরিই তাঁহাকে শোকে সান্ত্বনা দিন।

সমাপ্ত

রামকৃষ্ণ-সাহিত্য-কুটীরের

সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্র নারায়ণ শাস্ত্রী

ধর্ম্ম ও জাতীয় ভাবোদ্দীপক

প্রসিদ্ধ পুস্তকাবলী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট (এম-এ) ক্লাসের প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক, ঋষিকল্প দার্শনিক, পরম ভাগবত **মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুত ভাগবত কুমার গোস্বামী শাস্ত্রী** এম-এ; পি, আর, এস; পি. এইচ, ডি, মহোদয় বলেন—

১। **মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ**—সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রনারায়ণ সিংহ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রণীত এই ধর্ম্মতত্ত্ব-বিষয়ক গ্রন্থখানি পড়িয়া দেখিলাম। গ্রন্থখানি পরমার্থরহস্য জিজ্ঞাসুদিগের বড়ই উপাদেয় হইয়াছে। জীবতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব, কর্ম্ম-জ্ঞান, ও ভক্তিতত্ত্ব মোক্ষতত্ত্ব প্রভৃতি যাবতীয় দুরূহ তত্ত্বই গ্রন্থে অতি নিপুণ ও বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। যোগ ও যোগের সাধন সম্বন্ধে গ্রন্থকারের বিবৃতি ও উপদেশ সংক্ষিপ্ত হইলেও অতি সারগর্ভ। জন্মান্তর ও পরলোক সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা অবতারিত হইয়াছে, তাহা জটিল হইলেও গ্রন্থকার অতি সহজ ও সরল ভাষাতেই তাহার ব্যাখ্যান-বিশ্লেষণ করিয়াছেন। মোটের উপর এই সমস্ত গুরুতর সমস্যা সমাধান করা সম্পূর্ণরূপে সম্ভবপর না হইলেও গ্রন্থকারের ভাবুকতা, পাণ্ডিত্য ও লিপিচাতুর্য্যের নিদর্শন সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হয়, এবং অনুসন্ধিৎসু পাঠক গ্রন্থোক্ত সূত্র ধরিয়া অনায়াসেই অগ্রসর হইবার সুযোগলাভ করিবেন একথা খুব দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি। ১ম খণ্ড ১।০ ও ২য় খণ্ড ১।০ সিকা।

২। **পতিত জাতির কর্ম্মবীর**—সুদৃশ্য সিল্কের কাপড়ে

বাধাই সোনার জলে লেখা। দাম ২৲ টাকা মাত্র। ৫৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

Forward (Sunday, May, 1927) writes :—Patit Jatir Karmabir—by Sibendra Narayan Sinha. Published by the author from "Ramkrishna-Shahitya-Prachar Kutir This book contains the the life-stories of most of the great men who flourished in Bengal, begining with Chaitanya Dev, who enriched the public life, religion, and literature of Bengal, who—in a sense were instrumentel in building up the Bengali nation. The book as such is more than a collection of so many biographies but in a sense depict the growth of the nation, up to the begining of mordernisation with the advent of Raja Ram Mohan Roy. The style is simple and attractive the descriptions are picturesque. It is nc mean contrition to the Bengali literature. The printing and get-up are. on the whole good.

বঙ্গের অদ্বিতীয় দার্শনিক পণ্ডিত স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক, থিওজফিকেল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের স্বনামধন্য সহ-সভাপতি, হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারজীব **শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত-শর্ম্মা** এম, এ, বি. এল ; পি, আর, এস, বেদান্তরত্ন এটর্নি-আট-ল কি বলিতেছেন দেখুন—I have read Babu Sibendra Narayan Sinha's Patit Jatir Karmabir with interest and profit. The author has put together the life stories of Bengali 'Hero' who lived and mover in Bengal from the 16th to the 18 century and shed lusture on the Bengali name by their activities in different department of national life—religion, politics, literature, social reform, and trade and commerse—so that the reader is brought into touch

with personalities so divergent as Sree Chaitannya, Lala Babu, Ramdulal Sircar and Nandakumar. The incidents in the lives of these Herces appear to have been gleaned from authorative sources and arranged in an interesting manner and readable fashion. I wish the author who, I understand, is gcing to bring out a second part, evera success.

৩। যোগবল-রহস্য—অর্থাৎ ভারতীয় যোগী, সাধক, ভক্তগণের জীবনী ও যোগ শাস্ত্রের রহস্যকথা। শ্রীশিবেন্দ্রনারায়ণ সিংহ কর্ত্তৃক প্রণীত ও সম্পাদিত। ৬৪২ পৃঃ মূল্য ২৸৶॰ আনা মাত্র। "আনন্দবাজার পত্রিকার দোল সংখ্যায় প্রকাশিত, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার কর্ত্তৃক লিখিত 'নব্য অবতার' প্রবন্ধ এই গ্রন্থের অবতরণিকারূপে গৃহীত হইয়াছে। গ্রন্থকার উক্ত প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিয়া মন্তব্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, ধর্ম্মের নামে এরূপ কুৎসিত ব্যাপার বাঙ্গালাদেশে অনেক চলিতেছে এবং তিনি নিজে নানাস্থলে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন; প্রাণায়ামবলে সিদ্ধি লাভ বশীকরণ, সম্মোহন বিদ্যা প্রভৃতি আয়ত্ত করা যোগের অতি নিম্নস্তরের অবস্থা। সকাম ভণ্ড-যোগীরা এই সমস্ত 'অলৌকিক শক্তি' আয়ত্ত করিয়া দুর্ব্বলচিত্ত লোকদিগকে বশীভূত করিয়া ভগবানের অবতার সাজিয়া থাকে। গ্রন্থে এই সমস্ত প্রাথমিক যোগরহস্যের কথাও বিবৃত হইয়াছে কিন্তু গ্রন্থকারের প্রধান উদ্দেশ্য প্রকৃত যোগবল ব্যাখ্যা এবং ভারতের সাধু মহাত্মা ও যোগীদের চরিত্র কীর্ত্তন করা। গ্রন্থে ভগবান বুদ্ধদেব হইতে আরম্ভ করিয়া, আধুনিক পওহারী বাবা পর্য্যন্ত ঐতিহাসিক যুগের অধিকাংশ সাধু ও মহাপুরুষদের চরিত্রই আলোচিত হইয়াছে। তাঁহাদের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা, উচ্চ চিন্তা ও আদর্শ, মহান্ ধর্ম্মভাব লোকহিত প্রচেষ্টা, নিষ্কাম কর্ম্মযোগ, ভগবদ্ভক্তি, যোগবল, সব

কথাই গ্রন্থকার কীর্ত্তন করিয়াছেন। গ্রন্থের ভাষা অনাড়ম্বর, অথচ ওজস্বিনী, বিশুদ্ধ সাহিত্য হিসাবে সাহিত্যরসিকগণও ইহা পাঠে আনন্দিত হইবেন। দেশের চারিদিকে যখন ভণ্ডযোগী ও নকল অবতারের ছড়াছড়ি, তখন "আসল জিনিষের" পরিচয় দিবার জন্য এরূপ সদ্‌গ্রন্থের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। এই গ্রন্থ পাঠে নব্য বাঙ্গালার যুবকগণ উপকৃত হইবেন এবং অনেক প্রবীণের মোহও বিদূরিত হইবে, এই আশা আমাদের আছে। গ্রন্থকার শিবেন্দ্র বাবু গ্রন্থ রচনায় প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা পড়িলেই বুঝা যায়। ৫৪২ পৃঃ আয়তনের এরূপ সারবান গ্রন্থের পক্ষে ২॥৵০ মূল্য সুলভই বলিতে হইবে। ছাপা ও কাগজও উত্তম।—আনন্দবাজার পত্রিকা—২৮শে ভাদ্র ১৩৩৪।

৪। **"সচিত্র নবযুগের কর্ম্মবীর"**—অর্থাৎ বঙ্গের সাধক ভক্ত ও কর্ম্মবীরগণের জীবনী সংগ্রহ। প্রায় ৫৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। সুন্দর বাধাই মূল্য ২৷৵০ আনা। **দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের "বাঙ্গলার কথা"** (১৪ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫) কি বলিয়াছেন দেখুন:—

লেখক শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রনারায়ণ শাস্ত্রী ইতিপূর্ব্বে স্মৃতিপূজা, যোগবল-রহস্য পতিত জাতির কর্ম্মবীর প্রভৃতি পুস্তক লিখিয়া সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন— এই পুস্তকে তিনি বাঙ্গালার বহু সাধক, ভক্ত ও কর্ম্মবীরের জীবনী প্রদান করিয়াছেন। মহাপুরুষের জীবনকথা ও উপদেশ দেশে যত অধিক প্রচারিত হইবে, দেশ ততই উন্নতিলাভ করিবে। গ্রন্থকার নিজে ভাবুক ও সাধক কাজেই তাহার নিকট সাধক ও ভক্তগণের প্রকৃতরূপ ধরা পড়িয়াছে ও তাহার লেখনাতে তাহা স্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে।

৫। **স্মৃতিপূজা**—॥০ আনা ৬। **হিন্দুনারী**—১।০ সিকা। ৭। The Fair Sex of India—১।০ ৩ পদ্যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—১৲ মাত্র।

সংবাদপত্র ও উচ্চশিক্ষিত মণীষিগণের অজস্র প্রশংসাপত্র স্থানাভাবে মুদ্রিত হইল না।